চাঁচলের ইতিহাস

মেঘনাদ দাস

লেখক পরিচিতি ঃ জন্ম ১৯৬০ সালে ১৭ই জানুয়ারী চাঁচলের জেলে পাড়ায় (বর্তমান সুকান্ত পল্লী) পিতা বিনোদ বিহারী দাস ও মাতা ললিতা দেবী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক, ১৯৮২ সালে বানিজ্য বিভাগের ছাত্র হিসাবে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৯৮৪ সালে মালদা কলেজের সান্ধ্য বিভাগ থেকে বি-কম পাশ করেন। তারপর ১৯৯৩ সাল থেকে করনিক হিসাবে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে কর্ম জীবন আরম্ভ করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত অমর সংঘ ক্লাবের সম্পাদক, ২০০০-২০০৮ পর্যন্ত চাঁচল বাজার হরিবাসর কমিটির কোষাধ্যক্ষ, ২০০৬ সাল থেকে রোটারী ক্লাব অব চাঁচলের সদস্য, ২০০৫ সাল থেকে চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেলের হোষ্টেল সুপারিটেনডেন্ট, শিবরাম স্মৃতি স্টুডেন্টস ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ২০০৫ সাল থেকে, ২০০০ সাল থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সদস্য এবং ২০০৭ সাল থেকে শিহিপুর চাঁচল শ্মশান উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক। ১৯৮৪-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছর দেহশ্রী ব্যায়ামাগারের সম্পাদক আবার কখনও সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন সেবা মূলক কাজ তথা গঠন মূলক কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। নিজের সংসার ধর্ম পালন করবার পর লেখক কে পিতৃ প্রদত্ত একান্ত নিজস্ব ভোলে বাবার মন্দিরটি (গজানন শিবালয়) দেখাশুনা করতে হয়। সংসার জীবনের সব গুলো দিন থেকে একটু একটু করে সময় বাঁচিয়ে ২০০৬-২০০৮ সালের ৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই "চাঁচলের ইতিহাস" - নামে গ্রন্থটির মাধ্যমে চাঁচলের নতুন প্রজন্মকে কিছু অজনা তথ্য জানানোর প্রয়াস করেছেন তিনি।

মো০ আজীম আলী রেজবী

محمد ساجد رضا قادری رضوی کٹیہاری

চাঁচলের ইতিহাস

মেঘনাদ দাস

মূদ্রণে ঃ

রকমারী কম্পিউটার, চাঁচল থানাপাড়া

চাঁচলের ইতিহাস

A Brief History of Chanchal (Kharba) Thana Anchal

CHACHOLER ITIHAS

By. Rotarian Maghnad Das

Sukanta Pally (Jelepara), Chanchal, Malda

প্রকাশক ঃ

শ্রীমতী অরুনা দাস

প্রচ্ছদ ঃউৎপল দাস (বুলু)

প্রথম সংস্করন ঃ

৬-১২ই জানুয়ারী ২০০৯

২০ তম মালদহ জেলা বইমেলা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ

অরূপা সরকার, চাঁচল থানাপাড়া

ছবি ঃ

গৌতম কুমার মন্ডল, ভাকরী, চাঁচল।

মূল্য ঃ ৮০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

অভিনন্দন বুক সেন্টার, নতুন হাটখোলা, চাঁচল।

বুক্স এন্ড বুক্স, কলেজ রোড, চাঁচল।

উৎসর্গ

"চাঁচলের ইতিহাস" বইটি আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় বিনোদ বিহারী দাস মহাশয়কে উৎসর্গ করা হল।

শ্রী শ্রী শীতলা মাতা লেখনীর প্রথম নিবেদন

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে

আমাদের নমস্য অধ্যাপক অশোক ঘোষ মহাশয়ের কাছে চাঁচলের শিব্রাম চক্কোত্তির কথা শুনেছিলাম। পদার্থ বিদ্যার এই যশস্বী, মনস্বী অধ্যাপকের কাছে চাঁচল আর শিবরাম চক্কোত্তি ছিল সমার্থক। কিন্তু "ঈশ্বর পৃথিবী ভলোবাসা" এবং "ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর" খ্যাত শিবরাম চক্কোত্তির সাহিত্য প্রতিভা সমগ্র বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বিস্তৃত।

সুদূর শিবরাম চক্কোত্তিই নয়, চাঁচলের ইতিহাস, চাঁচলের জমিদারদের নানা ধরনের কথা, রাণী দাক্ষায়ণী স্কুল, চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের কথা এবং ইউরোপীয়ান গেষ্ট হাউসের মত পরিচিত এবং পন্ডিতদের সঙ্গে যেমন আমাদের পরিচিতি ঘটিয়েছেন শ্রী মেঘনাদ দাস, তেমনি চাঁচলের ইতিহাসের বহু অকথিত কাহিনী তিনি তুলে নিয়ে এসেছেন তার বই চাঁচলের ইতিহাসে।

শিব্রামের ভাষাগুন এবং তার শব্দ ব্রহ্ম সম্পর্কে বাংলা ভাষার পাঠককুল আদ্য পান্ত পরিচিত কিন্তু শ্রী মেঘনাদ দাস এমন এক পন্ডিত প্রবর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন যার সম্পর্কে আমরা প্রায় অপরিচিতই ছিলাম।

শিব্রামের থেকে ১৪-১৫ বছরের বড় ছিলেন তিনি। চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন। চাঁচলে থাকাকালীন "ভাতের জন্মকথা", "ভাবের জন্মকথা" এবং "পরগাছা" নামে তিনটি বই তিনি লিখেছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন।

চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসবার কথা জানিয়েছেন আলোচ্য বইয়ের লেখক। সবচেয়ে বড় কথা শ্রী বন্দোপাধ্যায় স্যার আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। ১৯২৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান, ছন্দ উপন্যাস যেমন পঞ্চললিত, আগুনের ফুলকি, ভিখারিনী, চোরকাটা সহ গল্প, অনুবাদ গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য তিনি রচনা করেছিলেন।

"চাঁচলের ইতিহাস" বইটি হাতে না পৌছলে চাঁচলের যশস্বী লেখক চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পর্কে জানাই যেত না।

চাঁচলের জমিদারদের বংশ তালিকা লেখক প্রকাশ করেছেন। জমিদারীর পত্তন হয়েছিল এখন যেটা চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেল নামে পরিচিত সেখানেই। ১৫৫০ -১৮০০ সাল অবধি অর্থাৎ মধ্য যুগ থেকেই চাঁচল জমিদারীর সূত্রপাত। এই পুরাতুন রাজবাড়ীতে থাকাকালীন জমিদার ইশ্বর চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তার জমিদারি পরিচালনা করতেন।

বর্তমান চাঁচল রাজবাড়িটি ১৮৭২-১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জন স্টুয়ার্ট লয়েডের তত্ত্বাবধানে পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরি বাহাদুর ১৯০৪ সালে এই নতুন রাজবাড়িতে প্রবেশ করেন। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন বিদ্যুৎমন্ত্রী মালদহের রুপকার গনিখান চৌধুরি সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রাজবাড়িতেই চাঁচল কলেজ গড়ে ওঠে। পাঁচ এর দশকে আচার্য বিনোবাভাবে, পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু ও বাংলার রূপাকার বিধান চন্দ্র রায়ের স্মৃতি ধন্য জুনিয়ার বেসিক কলেজ চালু ছিল।

১৮৬০ সালে এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব রাধাকান্ত চৌধুরির পিতা লোকনাথ চৌধুরি মহাশয় চাঁচল রাজবাড়ির সন্নিকটে এক অসামান্য ভাস্কর্য সমন্বিত এক শিবমন্দির স্থাপন করেন। আর এই শিবমন্দির সংলগ্ন স্থানে এবং জমিদারদের পূর্ণ সহযোগিতায় উইলিয়াম মার্সম্যন এবং হ্যালিড সাহেবের যৌথ উদ্যোগে একটি সংস্কৃত টোল বা চতুষ্পাঠি স্থাপিত হয়। দেশবরেন্য পন্ডিত শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রি মহাশয় সেই টোলের শিক্ষাগুরু হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সেখানেই কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বৌদ্ধ দর্শন, পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্রের অসামান্য দক্ষতার জন্য তাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশিকোত্তম উপাধী দিয়েছিলেন।

শিবরাম এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী এই দুই উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের উপস্থিতি তো আছেই শ্রী দাসের বইতে ; আছে প্রাক্ স্বাধীনতা পূর্বের একনিষ্ঠ অসহযোগ আন্দোলন কর্মী গিরীজা মুখার্জীর সঙ্গে নেতাজী সুভাষ বসুর অর্ন্তরনিহিত প্রসঙ্গ।

শ্রী দাস পেশায় সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষাকর্মী। এ বই রচনা করে শ্রী দাস আমাদের সকলের পূর্বসূরী চাঁচলের জমিদার পরিবার সর্বোপরী দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং অগনিত চাঁচলের ব্যক্তিদের ঋণ শোধের প্রয়াস নিয়েছেন। এটা এক মহৎ প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই।

শান্তনু বাসু

চাঁচল কলেজ

৬-১২ই জানুয়ারী, ২০০৯

২০ তম মালদা জেলা বইমেলা।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে

একথা সত্যি যে ভবিষ্যৎ কখনই সুদৃঢ় হয় না অতীতকে উপেক্ষা করলে। আর অতীত এবং ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। মাননীয় শ্রী মেঘনাদ দাস মহাশয়ের নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থখানি। চাঁচলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে "চাঁচলের ইতিহাস" গ্রন্থটি সমৃদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি। শুধু তাই নয় গ্রন্থটিতে এলাকার বহু প্রাচীন তথ্য, প্রামান্য ও চিত্রসম্ভার গ্রন্থকারের সুচারু-শিল্পীত্বের সাক্ষ্য বহন করেছে। শিথিলযোগ্য কয়েকটি মুদ্রন প্রমাদ ব্যতিরেকে গ্রন্থটির হিমালয়সম উৎকর্ষতা বাংলা সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধ করবে তা বলাই বাহুল্য। আগামী দিনের ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও পরিসংখ্যানবিদেরা এই গ্রন্থ থেকে তাঁদের প্রচুর রসদ সংগ্রহ করে যে সমৃদ্ধ হবেন- তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বোপরি সাধারন জনগন, ছাত্র, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে আশা করছি। মেঘনাদবাবুকে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর এই গ্রন্থটি আমাদের সকলকে উপহার দেওয়ার জন্য।

৬ই জানুয়ারী, ২০০৯
২০ তম মালদা জেলা বইমেলা।

ডঃ কমল কৃষ্ণ দাস
শিক্ষক
চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে

চাঁচল রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে বহু গবেষনা ও গ্রন্থ রচিত হলেও মেঘনাদ দাস মহাশয় রচিত "চাঁচলের ইতিহাস" গ্রন্থটি বিশেষ উৎকর্ষতার দাবী রাখে। কারন, চাঁচল রাজবাড়ী ও আনাচে কানাচে বহুঘটনা যা এতদিন অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল তা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। রাজবাড়ীর রাজাদের বংশপরিচয়, বিশাল ভুখন্ড, বিভিন্ন মৌজার নাম, বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ, পীরের কথা, পুরাকীর্তি, জনহিতকর কার্য প্রভৃতির এমন সুন্দর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সচিত্রগ্রন্থ এর আগে পাইনি। আশা করি মেঘনাদ দাস মহাশয়ের এই নিরলস প্রয়াস মালদাবাসী তথা সকল বিদগ্ধজনের হৃদয়ের স্পর্শলাভে ধন্য হবে। এই শুভকামনায়—

৬-১২ই জানুয়ারী, ২০০৯ — *শ্রী সুখেন্দু শেখর সিকদার*
২০ তম মালদা জেলা বইমেলা। — শিক্ষক- চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে

চাঁচল সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা অনেক দিন আগে থেকে মনে ভীর করেছিল। “চাঁচলের ইতিহাস” বইটি পড়ে চাঁচল সম্বন্ধে, চাঁচলের রাজপরিবার তথা জমিদারী সম্বন্ধে এবং চাঁচলকে ঘিরে প্রচুর মূল্যবান তথ্য জানা গেল। একজন জ্ঞান পিপাসু মানুষের কাছে বইটি এক বিরাট জ্ঞান সম্ভার। বইটির লেখক আমাপরই সহকর্মী শ্রী মেঘনাদ বাবু- তাই আমি বিশেষ ভাবে গর্বিত। শ্রী মেঘনাদ বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তার এই নিরলস প্রচেষ্টার জন্য। ব্যস্ততার জীবনে তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে চাঁচল তথা সমাজের সকল স্তরের শিক্ষিত মানুষের জন্য “চাঁচলের ইতিহাস” বইটি লিখে যে বিপুল তথ্য ভান্ডার উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। চাঁচলের ইতিহাস বইটি পড়ুয়াদের কাছে, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমস্ত শিক্ষিত মানুষের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হবে এই আশা রাখি। বইটির বিভিন্ন খন্ডে যেভাবে বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তা খুব সহজেই বোধগম্য হবে। বইটিতে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয় সম্বন্ধে অমূল্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে। আমি বইটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

৬-১২ই জানুয়ারী, ২০০৯
২০ তম মালদা জেলা বইমেলা।

আস্‌রারুল হক
প্রধান শিক্ষক
চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন

সূচীপত্র

এ কোন সুনামী (TSUNAMY)

এ কোন সুনামী এল চাঁচলের বুথে,
সব ব্যবসায়ীর মন যেন হয়ে গেল ফিকে।
২৬শে ডিসেম্বর সালটি দুই হাজার চার,
বিজ্ঞানীদের সব কিছু মেনেছিল হার।
কত শিশু হয়ে গেল অসহায় অনাথ,
ইউনিসেফ আর 'হূ' বারালেন সাহায্যের হাত।
ভাঙ্গা গড়ার খেলা ভাই চলবে বহু কাল,
ভূমি কম্পের কথা শুনি সকাল বিকাল।
মোরা পরিবেশ দূষণ করি আর বৃক্ষ চ্ছেদন,
মরু ভূমি হয়ে গেলে করতে হবে রোদন।
ভূমি কম্প, সাইক্লোন আর আতঙ্কবাদী হামলা,
বেসামাল হল সব মন্ত্রী আর আমলা।
ভারত বর্ষের মানুষ মোরা নয়কো বিচ্ছিন্ন,
শত বিপদ কাটিয়ে সবাই থাকবো অক্ষুন্ন।

—মেঘনাদ দাস

ভূমিকাঃ-

২০০৬ সালের মাঝামাঝির দিক থেকেই সরকার পক্ষের হঠাৎ করে মনে হল চাঁচল শহরকে জবর দখল মুক্ত করবেন। বেশ কিছুদিন ভূমি সংস্কার বিভাগের S.D.L.R.O.এবং B.L.R.O. এর যৌথ উদ্যোগে চাঁচলের মৌজা ৭০ ও সিঙ্গিয়া ৬৮ এলাকার জরীপ কার্য্য শেষ হলে চাঁচল বাসষ্ট্যান্ড লাগোয়া "শর্ম্মা সাউন্ড সার্ভিস"-এর সুন্দর কাঁচে মোড়া দোকান ঘরটি ভেঙ্গেফেললেন। এক এক করে ভেঙ্গে ফেলা হল চাঁচলের বহু এক তালা, দ্বি-তল ও তিনতলা দোকান ও বাড়ি সেদিন থেকেই মনে হয়েছিল চাঁচলের পথ-ঘাট আগে এমনটা ছিল না। আমরা একরকম চাঁচলের মানুষজন রাজ ইতিহাস আর কবি শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে ভূলেইগেছি। চাঁচলের প্রবীন ও প্রয়াত চিরস্মরণীয়যে সব ব্যাক্তিত্ব এক সময় বাংলার মানচিত্রে চাঁচলকে একটা ভালো জায়গা করে দিয়েছিলেন সে সবই এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। মনের মধ্যে প্রবল ইচ্ছে হল চাঁচলের নতুন প্রজন্মকে বিগত দিনের ইতিহাস লিখে জানানো। আমরা প্রায় ভুলে গেছি যে মহান স্বাধীনতা - সংগ্রামী সিদ্বেশ্বরী স্কুলের ছাত্র গিরিজা মুখার্জ্জীর কথা, চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, রসরাজ রস সাহিত্যিক শিশু শিল্পী কবি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর কথা। কিন্তু ইতিহাস লিখতে গেলে যে পরিমান উপাদানের প্রয়োজন তার বড্ড অভাব। আর এই অ-ভাব পূরন করতে হলেবেশ কিছু প্রবীন ব্যক্তি ও পুস্তক তথা লাইব্রেরীর সাথে ভাব জমাতে হবে। তাই এই ভাব জমাতে পাগলের মতো খুঁজে বেরিয়েছি কোচবিহার থেকে চাঁচল, মালদা, মালতীপুর, কলিগ্রাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, নদীয়া, ও জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতায়।

এক সময় মালদা জেলায় নীলকর সাহেবরা এসে নীল চাষ করতেন মালদা অতুল মার্কেটের পাশে আজ যেখানে রেড-ক্রশের বিল্ডিং হয়েছে সেখানেই ছিল পূরাতন ভাঙ্গা বাড়িযেখানে মালদা কলেজের উদ্বোধন হয়েছিল সেই পোড়ো বাড়িটাই ছিল নীলকুঠি। বিষ্ণুচরন বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, বৈদ্যনাথ সর্দার আর কালিয়াচকের রফিক মন্ডলকে রুখে

দাঁড়াতে হয়েছিল নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার মন্ত্রে গান গেয়ে চারন কবি মুকুন্দ দাস কে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল এই বাংলাবাসীকে উৎসাহ দিতে। চাঁচলে মরা মহানন্দার ওপারে অর্থাৎ সিঙ্গিয়ার আমবাগানে বসেছিল তার গানের আসর। গৌড়ের সিংহাসনে যখন মজনূন শাহ রাজত্ব করছিলেন তখন মালদায় ফকীর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'ভবানী ঠাকুর'-কে রাতারাতি অমর করে দিয়েছেন। বরেন্দ্রভূমিতে জমিদারদের প্রজা নিপীড়নের কথা বরনীয় লেখক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'লালমাটি' উপন্যাসে নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। চাঁচলেও জমিদারী আমলে প্রজা নিপিড়ন হলে শিবরাম বাবু তার "জমিদারের রথ" বইটি লিখেছিলেন।সে ইতিহাস ও চাঁচলের নতুন প্রজন্ম জানে না। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইতিহাসকে সাহিত্যের একটি শাখা হিসাবেই ধরা হত। ইতিহাস যদি হয় সমাজ বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা এবং ইতিহাস যদি হয় সমাজ বিকাশের নথি (Record) তাহলে সাহিত্য হল তার প্রতিফলন (Reflection)। ইতিহাস সাহিত্য থেকে তারলেখনীর উপাদান সংগ্রহ করে। আর ইতিহাস সকল সাহিত্যিক দের লেখনীর ও ভাবনার উপকরনকে সমৃদ্ধ করে এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

২০০৬-২০০৮ প্রায় তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের সোনার ফসল সদ্য প্রকাশিত (মালদা বইমেলায়) "চাঁচলের ইতিহাস" বইটি প্রায় ৪০ পর্বে বেরবার কথা ছিল কিন্তু মাঝ পথে কিছুটা অংশের লেখা সম্পূর্ণ হলে প্রথম খন্ড ৩৪পর্বে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। জানিনা মালদা তথা চাঁচলের পাঠক সমাজকে কতটা আনন্দ দিতে পারব। চাঁচলের জমিদারীর রাজ ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে লেখক, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা, ভৌগোলিক সীমানা, থানা সৃষ্টি, চাঁচলের পূর্ব নাম চাচর/ চাচড় কেন ছিল, নদী, মন্দির, মস্‌জিদ, পীর সাহেবের কথা, রাজাবাবু ও রানীমার এবং চাঁচলের প্রজাহিতৈষী প্রজামঙ্গল কামী জেলার ইতিহাসে

বিখ্যাত রাজ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর কথা আলাদা আলাদাভাবে (পর্বে) লেখার চেষ্টা করেছি।যে সব উৎসাহী মানুষ লাইব্রেরীয়ান, প্রবীন ব্যক্তি এবং পুস্তকাবলী আমাকে লিখতে উৎসাহ যুগিয়েছে তাদের কাছে আমি চিরঋণী।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "ইতিহাস হীন জাতীর দুঃখ অসীম"- তিনি অন্যত্র লিখেছেন " বাঙ্গালার ইতিহাস চাই বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" তাঁর এই খেদোক্তির কারন ছিল। সেদিন পাশ্চাত্য পন্ডিত ব্যাক্তিরা ভারতবাসীর দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করে বলেছিলেন ভারতীয়রা ইতিহাস লেখে না। তাঁদের কথাগুলি আংশিক সত্য ছিল কারন পরাধীন হওয়ার ফলে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে পঠন-পাঠন হতো তাতে থাকতো রাজা ও তার রাজত্বের জন্ম - মৃত্যু, উত্থান-পতনের কথা, রাজার বংশ তালিকা ও রাজ্য শাসন-প্রনালীর ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষ তেমন ইতিহাস রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিল না। কিন্তু ভারতবাসী ইতিহাস লিখতে জানতো না-এ কথা ঠিক নয়। আমাদের দেশের মহাকাব্য, পৌরানিক কাহিনী প্রভৃতিতে যা লিখিত আছে তাতে যেমন আছে রাজ কাহিনী তেমনিই আছে তদানীন্তন সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

মালদহের গৌড় পান্ডুয়া, আদিনা,একলাখি মস্‌জিদে, আর কোচ বিহারের রাজ ইতিহাসের কাহিনী বাদ দিলে উত্তর বঙ্গের সাহিত্য ও ইতিহাসের ভান্ডার খুব সমৃদ্ধ নয়। বলতে গেলে ১৭৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠেই উত্তরবঙ্গে উপন্যাসের ছোয়া লক্ষ্য করা যায়। উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক পর্যায় ক্রমে সামাজিক অর্থনৈতিক চিত্র আলোচনা করতে হলে এই উপন্যাস গুলি পড়ে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক পর্যায়-

উপন্যাসের নাম	লেখকের নাম	সময়কাল
সামন্ততন্ত্র-কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ	সত্যেন সেন	পাল যুগ
গৌড় জনকথা	চোমংলামা	পালযুগ
কামাতাপুরের পতন	সুকুমার দাস	১৪৮০-১৫০০
জমিদারী ব্যবস্থা আনন্দমঠ	বঙ্কিমচন্দ্র	১৭৬৫-৭৫ সাল
দেবীচৌধুরানী	ঐ	১৭৭২-৮৪ সাল
ভূমিরাজস্ব ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত,		
লালমাটি	নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়	১৯২৪-৪২সাল
গড় শ্রীখন্ড	অমিয় ভূষণ মজুমদার	১৯৪২-৪৭ সাল
১৯৬৭এর ভূমি সংস্কারের আন্দোলন,		
মহাকাল রথের ঘোড়া	সমরেস মজুমদার	১৯৬৭-৭১সাল
১৯৭৭এর ভূমিসংস্কার আন্দোলন,		
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত	দেবেশ রায়	১৯৭৭-৮৮ সাল
পারাপারের বৃত্তান্ত	চোমংলামা	১৯৬৭সাল
উত্তর বঙ্গের সামাজিক চিত্র বাগিচা ফসল বা চা শিল্প,		
উত্তরাধিকার	সমরেশ মজুমদার	১৯৪৭-৫৫সাল

লালমাটির দেশ বরেন্দ্রভূমি, বিশেষ করে গাজোল, হবিবপুর, বুলবুল চন্ডির জোতদার আর জমিদারদের প্রজা নিপিরনের কাহিনী পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁচল এলাকার প্রজা নিপিড়নের কথা শিবরাম বাবু

লিখেছিলেন বলে "জমিদারের রথ"- বই আইন বন্ধ করেছিলেন এলাকার জমিদার রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী। চাঁচল ডিভিশন এলাকার সুধী পাঠক সমাজ এই বইটি পড়ে এতটুকুও আনন্দ পেয়ে থাকেন তাহলে সেটাই হবে আমার পথ চলার পাথেয়।
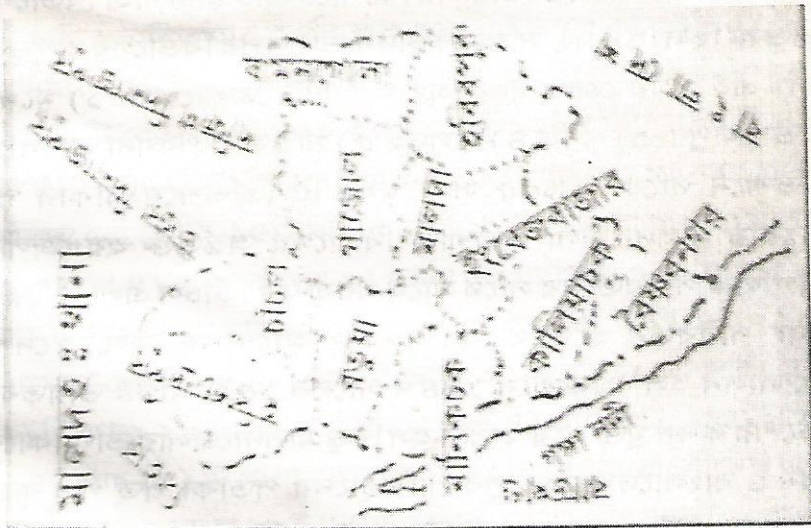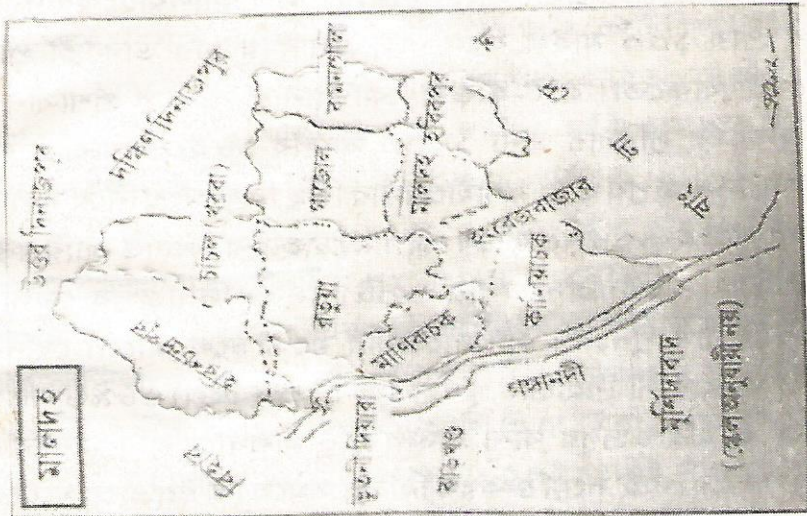
চাঁচলের আয়তন ও পরিসীমা

ভৌগোলিক অবস্থানঃ- ১৮১৩ সালের আগে পর্যন্ত আমরা মালদাবাসী কখনও পূর্ণিয়া জেলায় আবার কখনও রাজশাহী জেলার অর্ন্তভুক্ত ছিলাম। পূর্ণিয়া থেকে গঙ্গার পাশে কালিয়াচকের দূরত্ব ছিল প্রায় ১০০ মাইল ফলে এই এলাকায় চুরি ডাকাতী প্রায় লেগেই থাকতো। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য ১৮১৩ সালের ১৮ইফ্রেবুয়ারী মাসে পূর্ণিয়া. দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে মালদা জেলা সৃষ্টি হয়। ১৮৭৫ সালে জেলার চৌহদ্দির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তখন মুর্শিদাবাদজেলার ৬৫টি গ্রাম ও দিনাজপুর জেলার ২৩৭টি গ্রাম পুনঃরায় মালদাজেলার মধ্যে চলে আসে। সেদিন পর্যন্ত খরবাবাসী বিহারের পূর্ণিয়া জেলা ভুক্ত ছিল। ১৮৯৬ সালে খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা অঞ্চল দুটি মালদাজেলার মানচিত্রে প্রবেশ করে। এই সংযুক্তিকরন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ঘটেছে যেমন-১৮৭২ সালে বেভারলির রির্পোটে এটি রাজশাহী বিভাগের অর্ন্তভুক্ত ছিল। ১৮৭৬ সালে কিছুদিন ভাগলপুর বিভাগের অর্ন্তভূক্ত ছিল। এই সময় জেলা পঞ্চক অর্থাৎ পাঁচটি জেলাযেমন ১) মুঙ্গের ২) ভাগলপুর ৩) পূর্ণিয়া ৪) মালদহ ৫) সাঁওতাল পরগনা ভাগলপুর ডিভিশনে থাকে। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ঐ ডিভিশনে থাকার পর পুনঃরায় মালদাজেলা রাজশাহী বিভাগের অর্ন্তভূক্ত হয়।জেলার ভৌগলিক পরিবর্তনের সাথে সাথে খরবা তথা চাঁচল এলাকাটিরও ভাগ্য পরিবর্তন হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হল, স্বদেশী আন্দোলন হল, অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ব্রিটিশের কবল মুক্ত হয়ে স্বাধীন হল কিন্তু মালদাজেলার ভাগ্যাকাশে তখন ও বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্থানের পতাকা পত্ পত্ করে উঠছে। ১২ই আগষ্ট থেকে ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত মালদা জেলা বাসীর মানসিক অবস্থা ছিল খুব থম্থমে। মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায়

মুসলিমরা এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দুরা মাঠের জমি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সেদিন একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ছিলেন বলে তিনি সংকটময় দিনগুলির কথা আমাদের বলেছিলেন। কে কার জমিটি নিবে এই দ্বন্দ্ব আর চরম সংকটের মধ্যে কয়েকটি দিন কেটে ছিল- কারন তাহারা ভাবতে পারছিলেন না যে মালদাবাসী ভারতভূক্ত হবে না পাকিস্থান ভূক্ত হবে। মালদহের জমিদারগন নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে মিঃ র‍্যাডক্লিফ সাহেব মালদাকে ভারত ভূক্ত করেন।যে-হেতু ওল্ড মালদা-মালদা শহর হিন্দু প্রধান হলেও মালদাজেলাটি ছিল মুসলিম প্রধান এলাকা। সেইজন্য লর্ডমাউন্ট ব্যাটেন তার ৩রা জুনের ভারত বিভাগের পরিকল্পনায় মালদহকে পূর্ব-পাকিস্থানের অংশে দেখিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করে জওরলাল নেহেরু, মহম্মদ আলি জিন্না, এবং সর্দার বলদেব সিং বেতারে ভাষন দিয়েছিলেন। ১৫-১৭ই আগষ্ট মালদায় পূর্ব পাকিস্থানের সাব ডেপুটি আব্দুল করিম চৌধুরীকে মালদহের ট্রেজারীর দায়িত্বভার অর্পন করা হয়। এইভাবে কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর ১৭ই আগষ্ট রাত্রি বেলা মিঃ র‍্যাডক্লিফ কমিশনের ঘোষনাটি বেতারে প্রচারিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং (NOTIFICATION NO. 67GADATED-17-08-47) অনুসারে পূর্বের মালদহেরজেলার ১৫টি থানার মধ্যে ১) ইংরেজ বাজার ২) মালদা ৩) রতুয়া ৪) হরিশ্চন্দ্রপুর ৫) খরবা ৬) গাজোল ৭) হবিবপুর ৮) বামনগোলা ৯) মানিকচক ১০) কালিয়াচক, এই দশ (১০) বামোন গোলা থানাটি এলাকা ভারতের মানচিত্রে থাকবে। এবং ১) শিবগঞ্জ ২) নবাবগঞ্জ ৩)ভোলাহাট ৪) নাচোল ৫)গোমস্তাপুর , এই পাঁচ (৫) টি থানা এলাকা পাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশ ভূক্ত হবে। ১৯৪৭ সালে ১৮ই আগষ্ট মালদা জেলার শাসনভার পেলেন ভূতপূর্ব পাবনার এ.ডি.এম. কুমার মঙ্গলম। তিনিই প্রথম ১৮ই আগষ্টবেলা ১০টায় মালদার কালেক্টরেট অফিসে স্বাধীন ভারতের

পতাকা তুলেছিলেন। মালদাজেলার সাথে খরবা তথা চাঁচলের (চাঁচল থানাবাসীর) ভাগ্যকাশে একইভাবে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। সে কথা বলার কোন অবকাশ নেই।

চাঁচলের চৌহদ্দিঃ- এই থানার উত্তরে আছে বিহার ও দক্ষিন দিনাজপুর, পূর্বে ইটাহার ও গাজোল থানা এলাকা, দক্ষিনে আছে মালদাজেলার রতুয়া ও গাজোল এলাকা এবং পশ্চিমে আছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা। বর্তমানে মালদা জেলার পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে রাজমহল এলাকাটি ঝাড়খন্ড রাজ্যভূক্ত হয়েছে।

চাঁচলের আয়তনঃ বর্তমানে চাঁচল থানা অঞ্চলটি ৬৮.৩ কিমি এবং ১৯৩ টি মৌজা নিয়ে গঠিত কিন্তু ৩১ নংমৌজাটি বিহারের বারসোই থানার মধ্যে রয়েছে কারন হিসাবে বলা যায় ১৯৪১ সালে জেলা অর্ন্তভুক্তি বা জেলা গঠনের ফল স্বরূপ পূর্বে পূর্ণিয়াজেলায় ছিল এবং বর্তমানে কাটিহারজেলা ভূক্ত হয়েছে। চাঁচল -১ ও চাঁচল-২এর মৌজাগুলি ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী দেওয়া হল-

মৌজার নামঃ- ১- স্বরূপগঞ্জ, ২- নোনাতোড়, ৩-মল্লিক পাড়া, ৪- নিখরাল, ৫- মহানন্দপুর, ৬- সদুহাট, ৭- পশ্চিম ভগবানপুর, ৮- নৈধাকবুলহাট, ৯- উত্তরগোপালপুর, ১০-শেরপুর, ১১- গৌড়িয়া, ১২- উত্তর বসন্তপুর, ১৩-বাঘজন, ১৪- খুড়িয়াল, ১৫- শীতলপুর, ১৬- পাইকপাড়া, ১৭- নদীশিক, ১৮- পিরোজবাদ, ১৯- ইসলামপুর, ২০- হরিপুর, ২১- খদিয়ারপুর, ২২-অশ্বিনিপুর, ২৩- বোলতার, ২৪-গৌরিপুর, ২৫- রায়হাটা, ২৬- সঙ্কোলা, ২৭- ধনজনা, ২৮- হরিয়াঁ, ২৯- দইভাটা, ৩০- রাটোট, ৩১- বিহারে স্থানান্তরিত, ৩২- নয়ানপুর, ৩৩- রামদেবপুর,৩৪- রমাপুর, ৩৫- জোতচন্ডী, ৩৬- পূর্বভগবানপুর, ৩৭- শেরবাবর বলরামপুর, ৩৮- বাগুঞ্জা , ৩৯- নৈকান্দা, ৪০- চন্ডীপুর, ৪১-ভেবা কালিগঞ্জ, ৪২- তারাপুর, ৪৩- শক্তিহার, ৪৪- খরবা, ৪৫- আশাপুর, ৪৬-

শ্রীকৃষ্ণপুর, ৪৭- কোবাইয়া, ৪৮- ইসলামপুর, ৪৯- খরবা গোপালপুর, ৫০- পাঁচরেখা, ৫১- দিঘি, ৫২-বাশিলহাট, ৫৩-গৌবিন্দপুর, ৫৪- কেন্দুয়া, ৫৫-সাহাবাজপুর, ৫৬-খোসালপুর, ৫৭-অরবরা, ৫৮- বিবিঝুটি, ৫৯- ভগবতীপুর, ৬০- নবগ্রাম, ৬১- বালিডাঙ্গা, ৬২- মহব্বতপুর, ৬৩- আসরৈল, ৬৪- অলিহন্ডা, ৬৫- হাতিন্দা, ৬৬- শিহিপুর, ৬৭- খেলেপুর, ৬৮- সিঙ্গিয়া, ৬৯- ভাকরী, ৭০- চাঁচল, ৭১- উত্তর রসুলপুর, ৭২- কনুয়া, ৭৩ - উত্তর ভবানীপুর, ৭৪- রামপুর, ৭৫- ইলাম, ৭৬- গোরখপুর, ৭৭- পূর্ববেজপুরা, ৭৮- সদরপুর, ৭৯- বোয়ালিয়া, ৮০- সূতী, ৮১- কাপসিয়া, ৮২- ডুমরো, ৮৩-পূর্ব লাতাসি, ৮৪- গৌরহন্ডা আলাদিপুর, ৮৫-গৌড়হন্ড/গৌড়সন্ড, ৮৬- ইনায়ত নগর, ৮৭- ষোলবিঘা, ৮৮- জিতারপুর, ৮৯- আনন্দ গঞ্জ, ৯০- বেলুন গ্রাম, ৯১- দক্ষিন ভবানীপুর, ৯২- রংহাট, ৯৩- ইলাঙ্গী, ৯৪- শোলমারী, ৯৫- লাবিয়াবাড়ি, ৯৬- আওলেগাছিয়া চৌপুখরিয়া, ৯৭- দক্ষিন প্রাণপুর, ৯৮- উত্তর প্রাণপুর, ৯৯- চরোলমণি, ১০০- ক্ষেমপুর, ১০১- কাশিমপুর, ১০২- বেজলি, ১০৩- শ্রীপুর, ১০৪- ছিদামপুর, ১০৫- কান্ডারণ, ১০৬- চৈতনপাতি, ১০৭- মেঘদুমড়া, ১০৮- দমনভিটা, ১০৯- বাঙ্গাপাল, ১১০- শম্ভুনগর, ১১১- চাঁদুয়া, ১১২- গঙ্গাদেবী, ১১৩- গোপালপুর, ১১৪- দামাইপুর, ১১৫- কালীগঞ্জ, ১১৬- দুর্গাপুর, ১১৭- আলাদিপুর, ১১৮- শিমুলতলা, ১২০- ধুনদরিবন, ১২১- বেড়াডাঙ্গী, ১২২- বাসুদেবপুর, ১২৩- হরিশপাড়া, ১২৪- কাশিপাড়া, ১২৫- গোবিন্দপাড়া, ১২৬- গৌরসন্ডা, ১২৭- অনুপনগর, ১২৮- বর্ণা, ১২৯- মালতীপুর, ১৩০- মহদীপুর, ১৩১- মোহনপুর, ১৩২- কৃষ্ণগঞ্জ, ১৩৩- দক্ষিন শহর, ১৩৪- মহম্মদপুর, ১৩৫- বিদ্যানন্দপুর, ১৩৬- সাঞ্জীব, ১৩৭- বীরস্থলী, ১৩৮- দক্ষিন রসুলপুর, ১৩৯- লালগঞ্জ, ১৪০- মির্জাদপুর, ১৪১- গাহুলাপাড়া, ১৪২- পারাণিনগর, ১৪৩- আরাজ্জী গাহুলাপাড়া, ১৪৪- লক্ষ্মণপুর, ১৪৫- মতিপুর, ১৪৬-

জাকরপুর, ১৪৭- শালুকা, ১৪৮- রাজাপুর, ১৪৯- পাহাড়পুর, ১৫০- বাসুয়া, ১৫১- কলিগ্রাম, ১৫২- বগচরা, ১৫৩- ডোমবীর, ১৫৪- দক্ষিন বসন্তপুর, ১৫৫- মতিহারপুর, ১৫৬- শীতল দিলালপুর, ১৫৭- বলরামপুর, ১৫৮- শিবপুর, ১৫৯- বরাতর, ১৬০- জামগাছি, ১৬১- দাউদপুর, ১৬২- রামপুর, ভীমপুর, ১৬৩- মালচা, ১৬৪- মথুরাপুর, ১৬৫- খাজুর হুসানপুর, ১৬৬- পরশুরামপুর, ১৬৭- নরসিংহপুর, ১৬৮- যদুপুর, ১৬৯- ভান্ডারিয়া, ১৭০- কানাইপুর, ১৭১- চন্ডীপুর, ডারমার, ১৭২- বলরামপুর, ১৭৩- বলাকষ্ট, ১৭৪- রহিমপুর, ১৭৫- গাগ্‌রা, ১৭৬- বাকীপুর, ১৭৭- কুশমাই, ১৭৮- মগরামারা, ১৭৯- প্রতাপপুর, ১৮০- জনিপুর, ১৮১- রামপুর উজিতপুর, ১৮২- রামকৃষ্ণপুর, ১৮৩- মরকসুই, ১৮৪- ভাহুকা, ১৮৫- হজরতপুর, ১৮৬- জালালপুর, ১৮৭- বাহারাবাদ, ১৮৮- উজিতপুর, ১৮৯- চন্দ্রপাড়া, ১৯০- গোয়ালপাড়া, ১৯১- খাঁপুর, ১৯২- হোসেনপুর, ১৯৩- মাধাইহাট, ১৯৪- জগন্নাথপুর।

নোনাতোড় (২) জনৈক পীর সৈয়দ নোনা শাহ-এর নাম অনুসারে হয়েছে বলে কোনো কোনো মহল থেকে দাবি করা হয়।

ভূপ্রকৃতিঃ- ভৌগলিক দিক থেকে মালদাজেলাকে তিন বা চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১) বরেন্দ্র বা বরিন্দ্র বা বরিন্দ্র ভূমি, ২) টাল/তাল, ৩) দিয়ারা অঞ্চল, ৪) মধ্যভূমি। ওল্ড মালদা, গাজোল, বামনগোলা ও হব্বিপুর এলাকাটি বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল (খরবা) ও রতুয়াকে টাল/তাল বলা হয় কারন এই এলাকাগুলি ক্রমশ নীচু বলে। এবং ইংরেজ বাজার ও কালিয়াচক এলাকাটি মধ্যভূমি নামে পরিচিত। মানিকচক, রতুয়ার কিছু অংশ এবং কালিয়াচকের কিছু অংশ দিয়ারা অঞ্চল ভুক্ত। একদা খারোয়া (KHAROWA) বা খরবা এবং বর্তমান চাঁচল থানার অঞ্চলটির কথা বলতে গেলে বিখ্যাত ইংরেজরেনেল সাহেবের প্রথম নকসায় ১৭৬৪-৭৩ সাল মধ্যে মহানন্দা নদীটির অবস্থিতি

থানার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে অর্থাৎ স্বরূপগঞ্জ মৌজা ১ নং নীচ দিয়ে পশ্চিমদিকে বই ছিল যাহা বর্তমানে বারোবাসিয়া নদী নামে খ্যাত। সমস্ত চাঁচল থানা অঞ্চলটি টাল / তাল অংশ দ্বারা মহানন্দা নদী বিধৌত সমভূমি। প্রথমে পূরাতন পলিমাটি এবং পরে নবীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত। উত্তর দিকে চাঁচলথানার জমির উচ্চতা মধ্যম। বরিন্দ অপেক্ষা এখানে লোকসংখ্যা বেশি এবং এখানকার গ্রামগুলিও আকারে বড়। পূর্বথেকে পশ্চিমদিকে জমিগুলি ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে বলে টল বা টাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ টাল বা টল অঞ্চল অর্থাৎ টাল অর্থে তীর্যক বা ঢালু বোঝায় যাহার আক্ষরিক অর্থ জঙ্গলাকীর্ন বা জলাভূমি বিশেষ।

চাঁচলের জনসংখ্যাঃ- ১৯৯১সালের আদমসুমারী অনুযায়ী থানার লোক সংখ্যা ছিল, ২,৭৫,৯৮৫ জন তার মধ্যে ১,৪২,৩৪৩ জন পুরুষ এবং ১,৩৬,৬৪২ জন মহিলা। চাঁচল থানা এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে ৭৪৯ জন যার মধ্যে উত্তরাংশে চাঁচল ১ নং ব্লকের ঘনত্ব ৮৮৪ জন এবং দক্ষিনাংশে চাঁচল-২ নং এলাকার ঘনত্ব ৬৪৬ জন। তখনমোট স্বাক্ষরতার হার ছিল ৪৯.৬৮ জন, ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী থানার তপঃশিলী ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৪,৭৫০ জন এবং তপঃ উপজাতীভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১০,৯৩৯ জন মাত্র।

মালদহ ঃ ব্লক
চাঁচল- ১
চাঁচল- ২

চাঁচলের নামকরণ

১৫০০ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝির দিক থেকেই চাঁচল/চাঁচর/চাঁচড় নামটি আস্তে আস্তে মালদহের মানচিত্রে উঠে আসতে থাকে। চাঁচড়/চাঁচর এলাকাটি ভৌগলিক অবস্থান গত দিক থেকে দীর্ঘদিন পূর্নিয়াজেলার অর্ন্তগত ছিল। ১৮৯৬ সালের সময় থেকেই খরবা ও হরিশ্চন্দ্র পুর থানা অঞ্চল দুটি মালদাজেলায় প্রবেশ করে। ইংরেজ আমলে যখন চাঁচলেপোষ্ট অফিস ডাক-ও তার বিভাগ খোলে তখনই সর্বপ্রথম বোর্ডে দেখা যায় (CHANCHAL) শব্দটি (চঞ্চল) লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চাঁচলের পূর্ব নাম ছিল চাঁচর/চাঁচড় মরা মহানন্দার তীরে গড়ে উঠেছিল এই চঞ্চর ভূমি বা চাঁচর ভূমি। সমসাময়িক বিভিন্ন বই এবং অভিধান পড়ে যা বেরিয়ে আসে চাঁচর/চাঁচড় নামের অর্থ নিম্নরূপ।

চাঁচর/চাঁচড় বা চাঁচলএর অবস্থানগত ভৌগোলিক বিবরনে দেখা যায় এই এলাকাটি বরিন্দ্র ও দিয়ারার মধ্যবর্ত্তী জায়গায় অবস্থান এই টাল অঞ্চলটির। খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা অঞ্চল দুটির বেশীরভাগ এলাকা টাল বা তাল অঞ্চলভূক্ত এতে কোন সন্দেহ নেই। একদা মহানন্দার পশ্চিম দিকের অংশ ক্রমশ ঢাল ও নীচু হয়ে গেছে বলে শব্দটি টাল / তাল নামে খ্যাত। (৩৩ নং চর্যা পদেও দেখা যায় ঢেনঢন পাদের লেখায় টিলা বোঝাতে টাল বা টল্ চঞ্চল) অর্থাৎ টাল অর্থে বা তির্ষক অর্থে বা ঢালু বোঝায়। আক্ষরিক অর্থে চাচর মানে নীচু জঙ্গলাকীর্ন ভূমি বিশেষ। খরবায় চাঁচর বিলের নামওশোনা যায়। এক কথায় একদা প্রবহমান মহানন্দা নদীর বিধৌত সমভূমি বলে খ্যাত এই অঞ্চলটি খ্যাত হতে থাকে।

এলাকার স্বনাম ধন্য শিশু সাহিত্যিক তথা চাঁচলের রসিক রাজা শিবরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখেছেন।

"চাঁচরের মানকি কলা, জীবনের সার।"

উপরের আলোচনা থেকে যে টুকু নির্যাস বেরিয়ে আসে তার অর্থ হল মরা মহানন্দার তীরে গড়ে উঠা নদী বিধৌত চাচর ভূমি বা জঙ্গলাকীর্ন জলাভূমি বিশেষ।

ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় তাদের বাংলা অভিধানে চাঁচল কথাটির অর্থ বিশ্লেষন করেছেন এইরূপ চাঁচল কুঞ্চিত দোলযাত্রার আগের দিনে রাত্রে বেলা নেড়াপোড়া উৎসব বিশেষ চাঁচর বিন বা বি (চাঁচল শব্দটি বিশেষ্য বা বিশেষণ দুই অর্থেই ব্যবহিত হয়েছে।) চাঁচল নাম করনের অন্তে রয়েছে 'ওল প্রত্যয়' এই প্রত্যয়টির অর্থ সাধারন ভাবে বাংলা অভিধানের বাইরে।

একদা এই অঞ্চলে চাঁচর উৎসব খুব বিখ্যাত ছিল। এই উৎসব এক সময় নতুন ফসল ওঠার পরে ফসল উৎসবের দ্যোতক ছিল পরে তা হোলি বা চাঁচর/চাঁচড় উৎসবের অগ্রুৎসবে পরিণত হয়েছে। এই দিন অর্থাৎদোলের আগের দিন রাত্রে বা সন্ধ্যাবেলা জীবন্ত ভেড়া কে পোড়ানোর চল বা রীতি ছিল। অধুনা বাংলাদেশে এই চাচর উৎসবের প্রচলন খুব বেশী আকারে দেখা যায়। বাংলা দেশ থেকে আগত অধিবাসী বৃন্দদোল পূর্নিমার আগের রাত্রে চাচারী বা বাঁশের ঘরে আগুন দিয়ে বুড়ির ঘর পোড়ানোর প্রচলন ছিল। এই রকম ভাবে খরের তৈরীভেড়ার মূর্ত্তি পোড়ানো বা জ্যান্ত ভেড়ার গায়ে আগুন ছুঁইয়ে তাকে প্রতীকী ভাবে দগ্ধ করা ইত্যাদি আচরন ও কম বেশীদেখা যায়। বলাবাহুল্য এই উৎসবগুলি বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত তন্দ্রাচারী মহাযোগিদের আচরিত ধর্মাবশেষ ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় শ্রী চৈতন্যদেবের আগমনের পর বৈষ্ণব ধর্মের ব্যপক প্রভাব পরে। বিশেষতঃ মালদা জেলায় চৈতন্যদেবের আগমনের কারনে এই নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। তাই চৈতন্য দেবের আর্বিভাব দিবসকে সামনে রেখে প্রতি বছরদোল পূর্ণিমার আগের দিন রাতে পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হত শ্রী রাধাগোবিন্দের চাঁচর

উৎসব বা বহ্নুৎসব। একদা এই উৎসবের দিন চাচর/চাচারী উৎসব উপলক্ষে চাঁচল রাজবাড়ী থেকে অথবা কেও বলেন সিহিপুর দূর্গামন্ডপ থেকে পাহাড়পুর চন্ডীমন্ডপ পর্যন্ত ঢাক, ঢোল, সহকারে এবং রাজবারির হাতি গুলিকে শোভা যাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হত। অনেকের মতে এই জন্যও এই জায়গাটির নাম চাঁচর/চাঁচড় হতে পারে। এলাকার বিখ্যাত এই চাচর উৎসবের জনশ্রুতি থেকে চাঁচল/চাঁচর নামটি জেলার ইতিহাসে ধীরে ধীরে খ্যাত হতে থাকে।

বাংলা অভিধান থেকেঃ চাচর-বিন-কুঞ্চিত, কোকড়া (চাচর-চিকূড়) অর্থাৎ দোল পূর্ণিমার আগের রাত্রে বহ্নুৎসব বিশেষ বা মেড়াপোড়া (নেড়াপোড়া) বা বুড়াবুড়ির ঘরপোড়া। (সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা মেতেছে), সংচর্চরী। চাঁচর উৎসবকে কেউ বলে রাবনের, কেউ বলে অত্যাচারী রাজা কংসের আবার কেউ বা বলে মহিষাসূরের কুশ পুত্তলিকাকে আগুন জ্বালিয়ে বাংলা দেশের রমনীরা অশুভ শক্তিকে বিদায় জানিয়ে শুভশক্তির আগমনকে স্বাগত জানায়। বর্তমানে চাঁচলের বাসুদেব পাড়ায় বাসুদেব মন্দিরে বাসুদেব বাড়ীর রমনীরা চাঁচর / উৎসবের মধ্য দিয়ে বাসুদেব ঠাকুরের (কৃষ্ণ ঠাকুর) আরাধনায় মেড়াপোড়া / চাঁচর উৎসবকে প্রতি বছর পালন করে থাকেন।

চাঁচল কথাটির অর্থ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা স্থান নাম'— বইটিতে এই রকম করেছেন চাঁচল <চঞ্চড় (আগাছা বিশেষ),তাহলে চঞ্চর থেকে চঞ্চল বা চান্‌চল বা Chanchal নামটি আসতে পারে। এই কারনটির পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারন আজ থেকে প্রায় ৫০০ / ৬০০বছর আগে চাঁচলের / চাঁচড়ের উপর মহানন্দা নদীটির প্রাচীন খাত বয়ে চলত। পূর্নিয়ার জেলা থেকে মহানন্দার প্রাচীন খাতটি বা নদীটি বারসই থানা অঞ্চল অতিক্রমন করে চাঁচল থানার স্বরূপগঞ্জ-১মৌজায় প্রবেশ করেছিল। ১৫৯৫ সালের মুঘল মানচিত্রে ও এই মরা মহানন্দা নদী খাতটির

উল্লেখ্য পাওয়া যায়। একদা মহানন্দার প্রবাহমান চর ভূমিতে প্রচুর পরিমানে জন্মাতো চঞ্চর নামক আগাছা বিশেষ আর এই আগাছা প্রভাবিত এলাকায় গড়ে ওঠে চাঁচর/চাঁচড় ভূমিবা চাঁচর/ চাচড় গ্রাম। ১৭৬৪-৭৩ সাল মধ্যে ঐতিহাসিকরেনেলের নকসাতেও মহানন্দার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এই থানার অর্থাৎ চাঁচলের পাশ দিয়ে বহে যেতে দেখা যায়।

উপরের কারন গুলি বিভিন্ন লেখক ও লেখিকার অনুমান স্বাপেক্ষ মাত্র। আমার মতে চাঁচর উৎসব এর চঞ্চর ভূমি বা চাঁচর ভূমি নাম থেকেই জায়গাটি চাঁচর এবং পরবর্ত্তীকালে চাঁচল হয়েছে। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকেই চাঁচল জমিদারীর সুবাদে চাঁচর / চাঁচল নামটি জেলার মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

তথ্য সহায়ক পুস্তকাবলী

☆ বাংলা অভিধান- ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জ্জী।

☆ বাংলা স্থান নাম- সুকুমার সেন (পাতা ৯১)

☆ ভালবাসা পৃথিবীর ঈশ্বর- শিবরাম চক্রবর্ত্তী।

☆ অতীতের মালদহ - প্রবাল রায়- মালদা।

☆ জেলা মালদহের ইতিহাস ও মালদহ সমগ্র- আব্দুস সামাদ।

☆ মালদাজেলার ইতিহাস- ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ।

☆ মালদাজেলারইতিহাস চর্চা- শ্রীমতি সুস্মিতাসোম (অধ্যাপিকা -গৌড় কলেজ)।
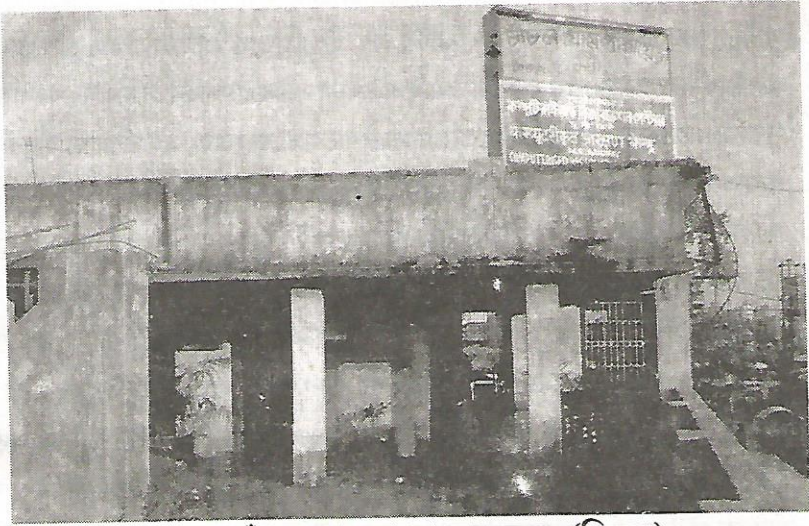
চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন (দ্বিতল)

চাঁচলের প্রশাসনের কথা

১৭৬৪-৬৫ সাল মধ্যে খরবা (খারোয়া/Kharowa) ও তুলসীহাটা থানা অঞ্চল দুটি দীর্ঘদিন পূর্ণিয়া জেলা মধ্যে ছিল। এই দুটি অঞ্চল পরবর্তীতে গরগরিরা নামে একটি থানা অঞ্চলে প্রবেশ করে। ১৮১৩ সালে মালদা জেলা সৃষ্টির সময় বিহার ও দিনাজপুরের কিছু অংশ মালদায় প্রবেশ করে কিন্তু ১৮৯৬ সালে খরবা ও তুলসীহাটার পরিবর্তে হরিশ্চন্দ্রপুর ও খরবা থানা অঞ্চল দুটির সৃষ্টি হয়। ১৮৮০ সালে মালদা জেলায় মোট ছয়টি রেজিষ্ট্রি অফিস ছিল সেগুলি হল (১) ইংলিশ বাজার (২) চাঁচল (৩) কালিয়াচক (৪) গোমস্তা পুর (৫) নবাবগঞ্জ এবং (৬) রতুয়া চাঁচল ইউ-বি-আই ব্যাঙ্কের সামনে ভাঙ্গা লাল বাড়িতেই দীর্ঘ দিন ছিল চাঁচল সাব রেজিষ্ট্রি অফিস। সেই সময় মুনাসিফস (MUNASIFS) কোর্ট ছিল একমাত্র ইংরেজ বাজারে এবং Criminal Court ছিল একমাত্র রাজশাহী তে। ১৮১৯ সালে চৌকিদারি আইন ব্যবস্থার প্রচলন হলে থানার পুলিশ অফিসাররাই গ্রাম্য এলাকায় চৌকিদার ও দাফাদারদের নিয়োগ করেতেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মালদা জেলায় ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে জেলা বোর্ড (Distric Board) গঠিত হয়। ১৮৬৯ সালে একসাথে মালদা ও ওল্ড মালদাতে পৌড়সভা গঠিত হয়। যা হোক প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য ১৮৭৬ সালে খরবা থানাটি সৃষ্টি হয় এবং একই সাথে পূর্ণিয়া জেলা কেটে তুলসীহাটা

থানার পরিবর্তে হরিশ্চন্দ্রপুর থানাটির জন্ম হয়। প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় চুরি ডাকাতি ও অপরাধ প্রবনতাকে বন্ধ করবার জন্যই এই থানা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। খরবা থানাতে সবসময়ের জন্য পোষ্টিং থাকতেন একজন দারোগা বাবু এবং এই দারোগা বাবুর অধীনে থাকত বেশ কিছু পুলিশকর্মী। থানার নীচু স্তরে থাকতো ইউনিয়ন পঞ্চায়েত। ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় (The act of 1870)। এই আইনের ফলে কম পক্ষে ৬০ (ষাট) টির বেশি বাড়ী নিয়ে গঠিত হয় একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত হত একটি চৌকিদারী পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন পঞ্চায়েত। গ্রাম্য পুলিশ, চৌকিদার ও দফাদার দের নিয়ন্ত্রন এবং তাদের বেতন দিতেন এই ইউনিয়ন পঞ্চায়েত। এই সময় চাঁচলেও (চাঁচরেও) একটি ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন বোর্ডে পরিনত হয়। এই ইউনিয়ন বোর্ড এর মাধ্যমে চৌকিদার ও দফাদারগন গ্রামগঞ্জের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। এমনকি ৪/৫ কিমি ব্যাপী প্রায় ৬/৭ টি গ্রামে সারারাত ধরে চৌকিদার ও দফাদারগন লণ্ঠন এবং লাঠি ও বর্ষা হাতে পাহাড়া দিতেন। বর্তমানে চাঁচল থানা অঞ্চলে যেভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি চলছে আগেও ঠিক তেমনি গ্রাম এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ড চালু ছিল খরবা থানা এলাকাতে ও সাধারন পুলিশের মত চৌকিদারদের ও খাকী পোষাক ব্যবহার করবার নীতি ছিল। এদের কোমরে বেল্ট এবং বাম হাতের কনুইয়ের উপরে একটি পেতলের ব্যাচ বাধা থাকত। চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান যে দোতালা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সেখানেই আগে টিনের ঘরে ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। চাঁচল ইউনিয়ন বোর্ডের শেষ দুজন চৌকিদারের নাম ছিল সিঙ্গিয়ার কান্তি দাস এবং সিহিপুর গ্রামের মদন দাস। এই দুজন চৌকিদার অল্প কিছুদিন আগে অবসর গ্রহন করে পরলোক গমন করেছেন। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব বিনোদ বিহারী দাস, প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ এই ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। বাবার সমসাময়িক ঁশ্রী শিব সন্তোষ চক্রবর্তী (পাহাড়পুর) এবং সুধীর কুমার চক্রবর্তী মহাশয় ও সদস্য ছিলেন দীর্ঘ দিন। চাঁচল বাজার থেকেঁ কালীপদ হোড়, বক্সীরাম আগরওয়ালা, প্রভৃতি গন্য মান্য ব্যক্তিগন ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৭২ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিল এর পরিবর্তে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং জেলায় -জেলা বোর্ড গঠন করা হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৭ সাল থেকে জাতির জনক মহাত্মাগান্ধির তৈরী ধাচে সারা দেশে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এই ব্যবস্থা সারা ভারত বর্ষে বর্তমানে চালু আছে।

চাঁচল ১ নং ব্লকের অধীনে ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম দেওয়া হলঃ

১। চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েত।

২। কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত।

৩। মতিহার গ্রাম পঞ্চায়েত।

৪। খরবা গ্রাম পঞ্চায়েত।

৫। মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

৬। অলিহণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত।

৭। ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

৮। মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

চাঁচল ২ নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি নিম্ন রূপ ঃ-

১। মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

২। জালাল পুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

৩। গৌড়হণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত।

৪। ভাকরী গ্রাম পঞ্চায়েত।

৫। খেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

৬। চন্দ্র পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত।

৭। ধানগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত।

চাঁচল - ১নং ব্লকে জানুয়ারী ২০০৮ অনুযায়ী লোকসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

ক) তপশীল জাতী -২৯,০২২ জন

খ) তপশীল উপজাতী -৭৩৫ জন

গ) সাধারন (OBC+ মুসলিম সহ) ১,৬১,২২২ জন

ঘ) সর্ব মোট - ১,৯০,৯৭৯ জন (মহিলা, পুরুষ ও শিশু সহ)

বর্তমানে আমরা রায়গঞ্জ -৫নং লোকসভার অধীনে ছিলাম অর্থাৎ মালদার তিনটি থানা এবং দিনাজপুরের ৪টি থা নাকে নিয়ে এই লোক সভা কেন্দ্রটি ছিল। রায়গঞ্জ লোক সভার বর্তমান সাংসদ মাননীয় প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এলকার উন্নয়ন কামী নেতা তথা উত্তর বঙ্গের জনকল্যান মুখী একনিষ্ঠ দেশ সেবক দীর্ঘ দিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লির এক হাসপাতালে ভর্ত্তি আছেন জ্ঞানহীন অবস্থায়। আমরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। লোক সংখ্যার চাপে বর্তমানে চাঁচল - ১ ও ২ (দুই) এলাকা নিয়ে বর্তমান ৪৫ চাঁচল বিধান সভার বিধায়ক আসিফ মেহেবুব প্রয়াত M.L.A. তার পিতা মহবুবুল হক্ (বাদল) এর জায়গায় উপনির্বাচন

করে এলাকার বিধায়ক হয়েছে। সম্প্রতি সরকারী রির্পোটে জানা গেল আগামীতে ৪৬-মালতীপুর নামে চাঁচল - ২ নং ব্লক এলাকায় আরো একটি বিধান সভার আসন বাড়ছে। সারাদেশে অ্যান্টিকোরাপশন শাখা বিস্তারিত হলেও যে হারে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্ণীতি বাসা বেধেছে তাতে করে গ্রামাঞ্চল আর জনগনের অবস্থার উন্নতির অবস্থা কতটা ভালো হবে তার আশাকরে কোন লাভ নেই।

যা হোক গত ১৯৭২ সালের ৮ই মে থেকে খরবার পরিবর্তে চাঁচলে বর্তমান থানাটি স্থানান্তরিত হয়েছে এবং পুরাতন চৌকিদারী ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। একজন পুলিশ আফিসারের সাথে গল্প করে যা জানা গেল দিন- দিন CRIME (অপরাধ) -এর পরিমান যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে মাত্র ১৫/২০ জন পুলিশকর্মী, কনসটেবল আর হোম-গার্ড কে নিয়ে চাঁচল থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে ধানগারা বিষন পুর বা হজরত পুর, জালালপুর বা বিহার সীমান্ত, জগন্নাথপুরে গিয়ে কতটা অপরাধ দমন করতে পারবেন সে কথা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। মালতিপুর ৪৬ নামে যদি আরএকটি বিধানসভা গঠিত হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে মালতিপুরে একটি নতুন থানা হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিবে প্রশাসনের সুবিধার জন্য। যা-হোক ভবিষ্যতে যদি ৪৬ মালতিপুর বিধানসভা এলাকায় একটি নতুন থানা হয় তাহলে পুলিশ প্রসাশনের কাজকর্মের অনেক সুবিধা হবে। ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে চাঁচল মহকুমা হলেও ট্রেজারি অফিসের কাজকর্ম এখনও পুরোপুরি ভাবে আরম্ভ হয়নি। মহকুমার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান চাঁচল রাজবাড়িটি খরিদ করেছেন।
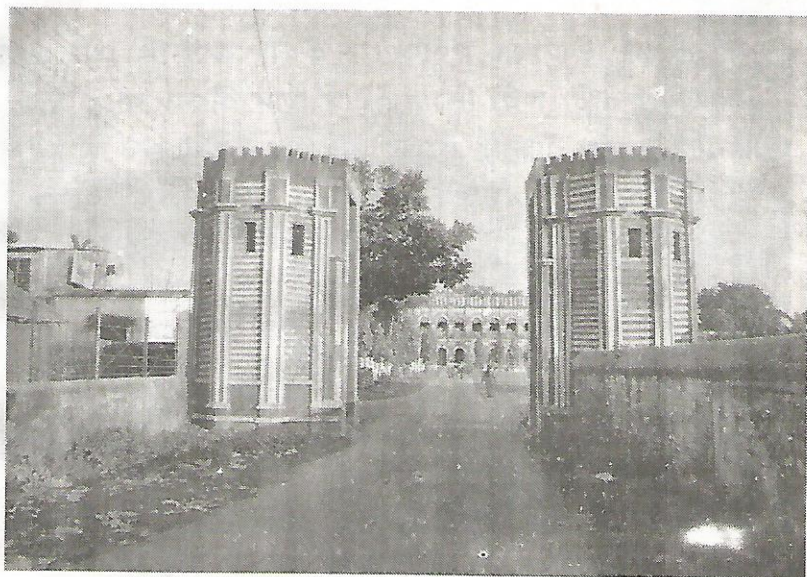
চাঁচল রাজ বাড়ির প্রবেশ দ্বার
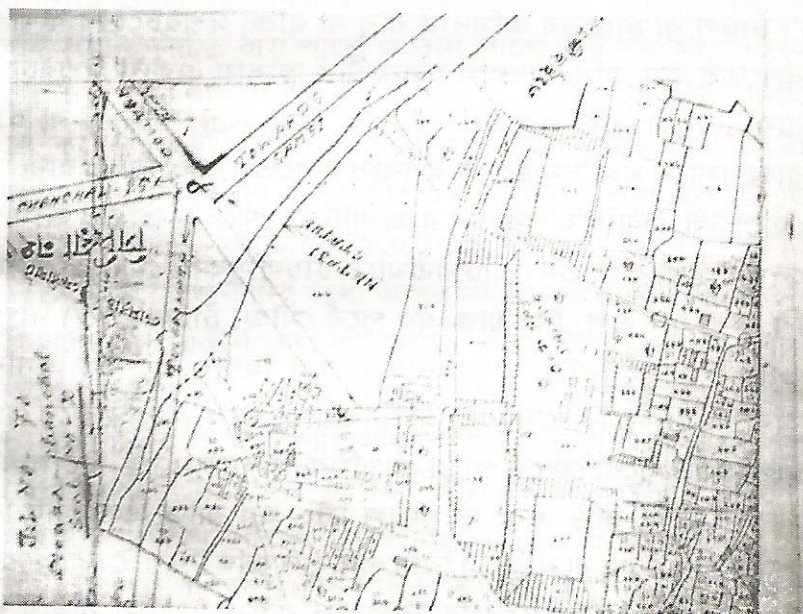
চাঁচল মৌজা নং ৭০ (সিট নং ২)

চাঁচলের পুরাতন রাজবাটি (বর্তমান চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল)

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পর্ব

চাঁচল বা চাচরের জমিদার বাবু বা রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের কথা বল্লে বলতেই হয় কবি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর ভাষায় একদা ঈশ্বরচন্দ্রের রায় চৌধুরী এই পুরাতন বাড়ীতে (Old Raj Palace) বা চাঁচল রাজপ্রসাদে মহা সমারোহে বসবাস করতেন এবং চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল এলাকায় পুরাতন রাজবাটিতে থেকেই তাঁহার জমিদারী দেখাশোনা করতেন। এটি বর্তমানে চাঁচল সুকান্ত মোড়ের পশ্চিমে বি.এস.এন.এল. টাওয়ার-এর পূর্বে মৌজা চাঁচল (৭০) দাগ নং ৬৪৫ (২ নং সিট) অর্থাৎ চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল এলাকায় অবস্থিত ছিল। বি.এস.এন.এল টাওয়ার থেকে আরম্ভ করে হোষ্টেল এলাকাটি পূরো জেলে পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ ঁউপেন্দ্র নাথ সাহার বসতবাড়ি এবং দুঃখুলাল সিং-এর বাড়ি এলাকাটি নিয়ে প্রায় তিন একর বা নয় (৯) বিঘা পরিমাণ জমি নিয়ে তৈরী হয়েছিল "ওল্ড রাজ প্যালেস" বা রাজ প্রসাদ বর্তমান বাবলু সাহার বাড়ি লাগোয়া যে ঘাট বাঁধানো পকুরটি আছে সেটি ছিল রাজপরিবারের

লোকদের গোসল পুকুর। এই পুকুরে বাইরেরকোন লোক বা রাজ কর্মচারীরাও আসতে পারত না। কারণ রাজবাড়ী লাগোয়া এক মাত্র পূর্বদিকে একটি মাত্র ঘাটবাঁধানো ছিল। চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেলের উত্তরদিকে ঘাট বাঁধানোযে পুকুরটি আছে সেটি রানী দিঘি বা রানী পুকুর নামে এখনও পরিচিত এবং রাজবাড়ীর উত্তর পূর্বদিকে বর্তমান চাঁচল জামে মসজিদের যে পুকুরটি আছেসেটি নয়া দিঘি নামে পরিচিত। এই পুকুরটির পশ্চিমপাড়ে ঘাঁট বাঁধানো দেখে মনে হয় হাতি শালার মাহুত এবং রাজ কর্মচারীবৃন্দ এই ঘাটে স্নান করতেন। রাজ বাড়ীর পূর্বে যে লম্বা পুকুর বর্তমান আছে সেটি মালধিয়ার অর্থাৎ মালদা থেকে আগত নীলমনি দাসের পুকুর নামে পরিচিত বর্তমানে গুড্ডুরামের পুকুর নামে পরিচিত হয়েছে। এই পুকুরটির ঘাট রাজবাড়ীর উল্টোদিকে বাঁধানো দেখে মনে হয় এটি প্রজাদের জন্য তৈরী হয়ে ছিল। এই রাজবাড়ী থেকে সোজা পূর্বে রাজবাড়ীর পূর্ব দরজা থেকে সোজা পূর্বে মরা মহানন্দার ফেরীঘাট পর্যন্ত যাওয়াযেত রাজপ্রাসাদের গেট পার হলেই সমান দূরত্বে বাম পাশে ও দান পাশে দুটি সম আয়তনের পুকুর এবং রাজবাড়ীর উত্তরে রানীদিঘি ও দক্ষিনে কুকুর দিঘি খনন করেন। এই গুলিদেখে মনে হয় পরিকল্পনা করে তৈরী করা হয়েছিল। চাঁচলের রসরাজ শিশু সাহিত্যিক শিব্রামের "ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা"- বইটি থেকেযে টুকু জানা যায় এই বিশালাকার চার (৪) মহল্লা রাজবাটির মধ্যে অন্দর মহলে বড় রানীমা থাকতেন পশ্চিমদিকের বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে। কবি শিবরামের পরিবার থাকতেন ইশ্বরচন্দ্রের সাবেক তোষা খানায়যেটি পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। রাজবাড়ীর লাগোয়া পশ্চিমদিকে ছিল গোসল পুকুর ও গোসল ঘর।গোসল ঘর পার হলে শিস্ মহল আর একধারে ছিল রঙ মহল। রাজবাটির দক্ষিন পশ্চিমদিকে ছিল মহাফেজ খানা যেখানে নিয়মিতভাবে একজন ডাক্তার বাবু বসতেন, পাশেই ছিল ডাক্তারবাবুদের থাকার জন্য বাড়ি বর্তমান বামুনপাড়ায়। রাজ

এস্টেটের পরিবারের লোকজনের চিকিৎসার ভার ছিল এই ডাক্তারবাবুর উপর। এই রাজবাটির চৌহদ্দীর মধ্যেই ছিল মালপত্র রাখার জন্য মালখানা। রাজবাড়িটির সামনে বর্তমান বি. এস. এন. এল. টাওয়ারের পিছনে বিশালাকার পাকা মেঝে যেখানে যাত্রাগান ও বোলবাই গানের আসর বসত। কবি শিবরাম সম্মর্কে শিব্রাম নামক পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বলে এখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পর্বে ফিরে আসছি। ওপরে উল্লিখিত রাজপ্রাসাদে থেকেই মহাসমারোহে বসবাস করতেন ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়।

রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের ঠাকুরদা অর্থাৎ রামচন্দ্র রায় চৌধুরীর পিতা সাবর্ণ রায় চৌধুরী অধুনা বাংলা দেশের যশোহর নিবাসী কলিকাতা কালীঘাট মন্দিরের পূজারী ছিলেন, তিনি একসময় নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে গৌড়হন্ড/গৌড়সন্ড পরগনাটি কিনে নেন।কোন এক ইংরেজ টাকীর জমিদারী চালাতেন এবং নীলচাষ করতে হরিশ্চন্দ্রপুরের সাতন কুঠিতে থেকে জমিদারী পরিচালনা করতেন। মালদাজেলায় নীলচাষ হোত-এ কথা সকলের জানা আছে ইতিহাসও তাই বলে। নীলচাষে নীলকর সাহেবদের লাভ হতো সব থেকে বেশী আর চাষীদের ভাগ্যে জুটতোলোকসান ও লাঞ্ছনা। একবার জমি দাদন নিলে বংশ পরম্পরায় নীল চাষ করতে হতো চাষীদের। কালিয়াচকের রফিক মন্ডলকে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হয়েছিল। শেষের দিকে নীল বিদ্রোহের আগুন সারা দেশে জ্বলে উঠলে নীল কর সাহেবরা মালদা ছেড়ে পালিয়ে যান। এই সময় সাবর্ণ রায় চৌধুরী মহাশয় হরিশ্চন্দ্রপুরের সাতন কুঠির নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে গৌড়হন্ড পরগণাটি খরিদ করিয়া নেন। লোকমুখেশোনা যায়যে সাবর্ন রায় ও তাহার পুত্র রামচন্দ্র রায় প্রথমে গৌড়হন্ড এবং পরের কাছাকাছি একটু ভাল এলাকা মালতীপুর আসিয়া বসবাস করেন। এখানে বসবাসকালে মালতীপুরে বিখ্যাত কালীপুজার এবং পাহাড়পুরে চন্ডিমন্ডপে দূর্গাদেবী চন্ডীরূপে

পূজার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। এই কালী পূজার কথা ও চন্ডি মন্ডপ ও সতীঘাটের কথা আলাদা পর্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডর মলের আমলে বাংলায় ১৯টি সরকার ও ৬৮২ টি পরগনা ছিল। বাংলার সুবাদার শাহ সুজার আমলে বাংলায় ৩৪ টি সরকার এবং ১৩৫০ টি পরগনা ছিল। আবার ১৭২২ খ্রীঃ মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে বাংলায় ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনা বিদ্যমান ছিল। মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে উক্ত জান্নাতাবাদের অধীনে মালদা জেলায় ৬৬টি পরগনা ছিল।যেমন রাঙামাটি, শেরশাবাদ, রামাউতি, হাতান্দা/ হাতিন্ডা(হোতিন্ডা বা হাতি কান্দা নামকরনের কারন হিসাবে বলা যায় যে এই পরগনাটি এত বড়ো ছিলযে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে একটি হাতিও কেঁদেফেলতো)। টাঁড়া বাকোতয়ালি,গৌড়হন্ড বাগৌড়সন্ড রুকনপুর, রাজনগর, সম্বলপুর, ষাট হাজারী ইত্যাদি আগেই বলেছি জমিদার ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র রায়চৌধুরী ২৪ পরগনা টাকীর জমিদারের নিকট থেকে ৯১০০ পাউন্ডে খরিদ করে নেন । এইগৌড়সন্ড বাগৌড়হন্ড পরগনাটির তখন আয়তন ছিল২৪,৯১৬ একর ভূমি বা ৩৮.৯৩ বর্গমাইল জমি। ১৮৫২ সালে (Revenue Board of Survey)-এর রিপোর্টি থেকে জানা যায় পূর্ণিয়ার কিছু অংশ খরবা থানা এলাকায় চলে আসে। অকূলে চাঁচল রাজ এস্টেটের আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ২৮,৩৪২একর বা ৪৪.২৮ বর্গমাইল। তার মধ্যে Barren Land বা অনুর্বর পতিত জমি ছিল ১৭,২৬৯ একর, Lakhi Raj বা নিস্কর জমি (Rent Free Land) ছিল ১৭৮৯ একর এই এলাকাটি নিয়ে চাঁচল-১ ও চাঁচল- ২ ব্লক এলাকায়মোট ১৯৩টি মৌজা ছিল, পূর্ণিয়াজেলা কেটে হাতিন্ডা পরগণাটি মালদা জেলায় প্রবেশ কালে ৩১নং মৌজাটি এখনও বিহারে থেকে যায় কারণ এই মৌজাটি স্বরূপগঞ্জ-১ এর নিকট মহানন্দা নদীখাত টির ওপারে ছিল ফলে

এলাকা টুকু মালদা জেলা ভুক্ত হলো এবং হাতিন্ডা পরগনায় এলো তার পরিমান ৩,২৩৯ একর বা ৫.০৩ বর্গ মাইল বিস্তৃত ছিল। লোক মুখে কথিত আছে এই এলাকাতে প্রায় ৫টি জোতদারী স্টেট ছিল যেমন- চাঁচল রাজ এস্টেট, বিরুয়া এস্টেট, হরিশ্চন্দ্রপুর এস্টেট এবং বিহার, বারসোই এস্টেট প্রভৃতি লোকমুখে প্রবাদ অছে যে এই এলাকায় একজন ফকির ছিলেন বা পীর আঁখি সৈয়দ সিরাজশাহ বা কেও বলেন পীর সাহেব ছিলেন তিনি এক নবাবের কন্যাকে সুস্থ করে তুললে হাতিন্ডা পরগনাটি তাকে দান স্বরূপ দেওয়া হয়। এই পীরসাহেব (প্রকৃত নাম পীর আঁখি সৈয়দ সিরাজশাহ বা কেও বলেন পীর আঁখি সৈয়দ সিরাজ জালালুদ্দিন শাহ) বয়স কালে পবিত্র হজ করিবার যাত্রাকালে মক্কায় যাত্রাকালে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রেখে যান হাতিন্ডা পরগনাটি। এবং মৌখিক শর্ত থাকে যে তিনি যদি কোনও দিন ফিরে আসেন তাহলে হাতিন্ডা পরগনাটি ফেরৎ নিবেন নতুবা নয়। এই ভাবেই হাতিন্ডা পরগনাটি চাঁচল রাজ এস্টেটভূক্ত হয়। পরবর্ত্তীকালের এক রির্পোটে জানা যায় যে এই দুটি পরগনার মিলিত জমির পরিমান দাঁড়ায় ১৮৭৩ সালে প্রায় ৮০,৪৭১ একর বা ১২৫.৭৩ বর্গমাইল। তাঁর মধ্যে ৩১,১৪৫ একর অনুর্বর জমি ৫,২৫৬ একর লাখিরাজ বা নিষ্কর জমি (Rent free Land) এবং ২৯১২ একর জমি ছিল সার্ভিস ল্যান্ড (Service Land)। প্রকৃত চাষযোগ্য জমির পরিমান ছিল (Cultivating Land) ৪১,১৮৮ একর। এই জমি ৯২০২ জন চাষীর (Cultivating Tenant) এর মধ্যে বন্টিত হয়েছিল। এই চাষীদের মধ্যে ৪,৮০৩ জন ছিলেন হিন্দুচাষী এবং ৪,৩৯৯ জজ্ঞ ছিলেন মুসলমান চাষী। (The Final Sattlement Report on the Servey of Malda District by W.W.HunterPage-134)

পূর্বে আলোচিত হয়েছে ১৮৪৮ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে চাঁচল রাজ এস্টেটের জন্ম হয়। এইস্টেট সৃষ্টির পর জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায় ১৮৫০সালে ওল্ড মালদার নিকটবর্ত্তী রোকনপুর পরগনাটি

নীলামে উঠলে তিনি বড়রানী সিদ্ধেশ্বরীর নামে রাজাবাবু রোকনপুর পরগনাটি খরিদ করেন ঐ বছর এপ্রিল থেকে জুন মাস নাগাদ রোকনপুর পরগনাটি অর্থাৎ মহানন্দার তীরে ওল্ড মালদা সহ পুকুরিয়া, কোতুয়ালী, মাদিয়াঘাট, গোবরজনাসহ আড়াইডাঙ্গা এবং পরানপুর থানা এলাকাসহ রতুয়ার কিছু অংশ সহ প্রায় ৪০,৮৫৩ একর জমি বা ৭৬.৩৩ বর্গমাইল জমি চাঁচল রাজ এস্টেট ভূক্ত হয়ে যায় According to the Board of Returns-এর সূত্র থেকে জানা যায় যে এই এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় বড় জলকর ছিল যেমন জলকর বাথান সব থেকে বড় নামী জলকর ছিল এখানে প্রচুর পরিমানে মাছ পাওয়া যেত। প্রথমদিকে জমিদারবাবু রোকনপুর পরগনাটির খাজনা ইংরেজ সরকারকে খাজনা না দিতে পারলেও পরবর্তী কালে চাষীদের ওপর কিছু রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি করে সব কেয়া খাজনা বা রাজস্ব পরিশোধ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মালদা জেলার জমিদারী ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। অনান্য জমিদারী/এস্টেটের তুলনায় এখানকার রাজ কর্মচারীদের বেতন ভালো ছিল এবং প্রজাদের জমির রাজস্ব বা খাজনা অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলে ইংরেজ বাহাদুরের কাছে একটি বিশেষ জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বলতেগেলে বলা যায় যে পরবর্তী কালে তাহার পরবর্তী দত্তক পুত্র (Adapted Son) রাজা শরৎচন্দ্রের ইউরোপিয়ান দের কাছথেকে রাজা উপাধি পাওয়ার পথ সুগম করে গেছিলেন। এই তথ্যাবলী The Statistical Account of Bengal (1876)- By W.W. Hunter (P-140)- এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়। জমিদার ঈশ্বরচন্দ্রের জমিদারী এলাকাগৌড়হন্ড, হাতিন্ডা ও রোকনপুর এলাকা নিয়েজেলার জমিদারী বা জোতদারীর ইতিহাসে চাঁচল রাজ এস্টেট একটি বিশেষ জায়গা করে নেয়।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয় মুর্শিদাবাদজেলার জঙ্গীপুর এলাকার এক বুদ্ধিমতী পরমা সুন্দরীর সহিত। তাঁহার নাম ছিল

সিদ্ধেশ্বরী বড়ো রানীমা ছিলেন খুব শিক্ষিতা ও জ্ঞানী। কিন্তু বড়ো রানীরকোন সন্তান না হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তীকালে ভূতেশ্বরী নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। ভূতেশ্বরী কলিকাতার দর্জিপাড়ারমেয়ে ছিলেন।ছোট রানীমা ভূতেশ্বরীর তিন (৩) কন্যা সন্তান হয়। বড়োমেয়ের বিয়ে হয় কলিকাতার গোপাল ব্যনার্জ্জীর সাথে। বড়ো রানীর সিদ্বেশরীর ডাকে মেয়ে জামাই স্ব- পরিবারে চাঁচলে বামুন পাড়ায় আসেন। তাহাদের ছেলে চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবি শিবরামের থেকে ১৪/১৫ বছরের বড়ো ছিল। চারু বাবু চাঁচল সিদ্বেশ্বরী বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন। চারু বাবু চাঁচলে থাকার সময় "ভাতের জন্ম কথা" "ভাবের জন্ম কথা" এবং "পরগাছা" বই তিনটি লিখেছিলেন। বাল্যকালে চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্বেশ্বরী বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়াশেষ করে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্ম জীবনে তিনি "ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স হাউস" -এর সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত চারু বাবুর সাহিত্য জীবনের কৃতিত্বময় সময় ছিল। প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা দিয়েই তাহার সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে তিনি রবিঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তারপর ১৯২৪সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। চারুবাবুকে রবীন্দ্র প্রভাবিত লেখক বলা হয়। তাহার রচনাগুলি হল-

উপন্যাস-

পঙ্কললিত,আগুনেরফুলকি,যমুনাপুলিনে ভিখারিনী,চোরকাঁটা, সর্বনাশেরনেশা, জোড়-বিজোড়,লোঙর ছাড়ানৌকা,

অদর্শনা, সদানন্দের বৈরাগ্য, বায়ুবহে পুরবৈয়া,
ব্যবধান, আলোকলতা।

গল্পগ্রন্থ- পুষ্পপাত্র, সওগাত,

চাঁদমালা, ধূপছায়া, বরনডালা, মনিমঞ্জীর, কনকচূড়, পঞ্চ
দর্শী, বনজ্যোৎস্না, শশীমাখা
দেওলিয়া, জমাখরচ, বজরাহত, বনস্পতি ও যাত্রা সহচরী।

অনুবাদ গ্রন্থ- অবিমারক (ভাস), রত্নাবলী, পারস্য
উপন্যাস, রবিনসন ক্রুসো, ঈশ্বরের গল্প, কাদম্বরী।

শিশুপাঠ্য-বিষ্ণুপুরাণ, ভাতের জন্মকথা ও পরগাছা।

প্রবন্ধ-রবির শিল্প (দুই খন্ড) বেদবানী (প্যারীমোহন সেন...)
চন্ডীমঙ্গল বোধনী, বিদ্যাপতী চন্ডীদাস।

চাঁচলের এই বিশিষ্ট লেখক ১৯৩৮ সালে পরলোক গমন করেন।

ভূতেশ্বরীর অন্য মেয়ে হুগলী জেলার জিরাটে নবকুমার মুখার্জ্জীর সাথে বিয়ে হয়। পরবর্তী কালে বড়রানী সিদ্বশ্বরীর ডাকে চাঁচলের বামুন পাড়ায় অর্থাৎ পুরাতন রাজবাটির খুব কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করতেন। নব কুমার বাবুর ছেলে সুরেশ মুখার্জ্জীর চার ছেলে - ১) দুর্গা চরন মুখার্জ্জী, ২) সত্যচরন মুখার্জ্জী- সিদ্বেশ্বরী বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহনের পর চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছিলেন। সত্যচরন মুখার্জ্জী একজন সৎ ও নিষ্টাবান ব্যক্তি হিসাবে আজও আমাদের মাঝে চির স্বরনীয় হয়ে আছেন। ৩) তৃতীয় পুত্র ভবানী চরন মুখার্জ্জী ৪) শ্যামাচরন মুখার্জ্জী আমার পিতৃদেব ঁবিনোদ বিহারী দাসের সমসাময়িক বাল্য বন্ধু ছিলেন। তিনিও বর্তমানে বাস্তু বাড়ি বিক্রী করে সম্প্রতি কলিকাতায় বসবাস করছেন। তিনি ভারতীয় রেল বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। শ্যামা কাকু বা নানু কাকু বাদে সকলেই পরলোক গমন করেছেন। কিছুদিন আগেও শ্যামাচরন মুখার্জ্জী বা নানু কাকুর সঙ্গে আমার

বহুবার দেখে সাক্ষাৎ হয়েছে আমি খুব আগ্রহী ছিলাম বলে রাজ বাড়ির অনেক গোপন কথা তার মুখে শুনেছি। শুনেছি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মৃত্যুকালে তাহার স্থাবর-অ-স্থাবর সম্পত্তির একটি উইল করে গেছিলেন। সেই উইলে নানু কাকুর বাবা সুরেশ চন্দ্র মুখার্জ্জী স্বাক্ষর করে স্বীকার করলেই রাজবাড়ির সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারতেন কিন্তু সিদ্বেশ্বরীর বোনের অর্থাৎ বিন্ধ্যেশ্বরী বা তাঁহার স্বামীর বংশধর গন খুব সৎ বংশের লোক ছিলেন বলে পরের সম্পত্তিতে তাদের এক ফোটাও লোভ-লালসা ছিল না। এই বংশের সত্য বাবু চাঁচলের প্রধান হিসাবে সত্য বাদিতার কথা চাঁচলের লোক সবাই জানে।

আমরা চাঁচল/চাঁচড় বাসী একদা এই খরবা থানা এলাকাটি নীচু জংলা-জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল কারন খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা দুটি মালদার টাল/ তাল অঞ্চলে অবস্থিত। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে জেলার ইতিহাস-ভূগোলের মানচিত্রে একটু একটু করে জায়গা করতে থাকে।

বড়রানি সিদ্বেশ্বরীর অপর দুই ভগিনীর বিবাহ হয় মুর্শিদাবাদের চোয়া গ্রামের নবকান্ত চক্রবর্ত্তীর দুইছেলে শিবচরন ও শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর সাথে। শিবচরন বাবুর বংশাবলী বর্তমানে পাহাড়পুরে চন্ডিমন্ডপের কাছে বসবাস করছেন। এবং চাঁচলের বিশিষ্ট লেখক শিবরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়-এর পিতা ছিলেন শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। বড়রানি সিদ্বেশ্বরী শিবপ্রসাদকে নিজ বাসভবনে চাঁচলে পুরাতন রাজবাটিতে নিয়ে আসেন অর্থাৎ বামুনপাড়ায় পুরাতন রাজবাটিতে রেখেছিলেন অপুত্রক-সিদ্বেশ্বরী চেয়েছিলেন বোনপোকেই দত্তক হিসাবে গ্রহন করবেন। কিন্তু শিবরাম চক্রবর্ত্তীর দাদা ছিলেন আত্মভোলা ফলে তাহাকেপোষ্য পুত্র হিসাবে মেনে নিতে পারেন নি। জেলার অন্যান্য রাজ এস্টেটের তুলনায় চাঁচল এস্টেটের কর্মচারী তথা ক্ষেত মজুরদের বেতন ভালো ছিল। প্রজাদের মঙ্গলের

কথা মাথায়রেখে জমিদার বাবু প্রতিটি গ্রামে পুকুর খনন পানীয় জলের জন্য কূপ খনন তথা রাস্তঘাট-এর ভালো ব্যবস্থা করেছিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র সিদ্বেশ্বরী রানি যাহাতে দত্তক গ্রহন করতে পারেনসে ব্যবস্থা করে যান। ১৮৬৫-৬৭ সালের মধ্যে রাজাবাবু বামুন পাড়া লাগোয়া রাজ বাড়িতেই পরলোক গমন করেন।এলাকার মানুষ এই জমিদার বাবুদের রাজা বলে জানলেও প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই ছিলেন এক-একটি এলাকার জমিদার মাত্র। পরবর্ত্তী বংশধর এলাকার স্বনাম ধন্য জমিদার শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী তাহার জনহিতকর কার্যকলাপের জন্য১৯১১ (১৯১২) খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে রাজা উপাধি লাভ করেন। রাজা শরৎচন্দ্র নামক পর্বে বিস্তরিত আলোচিত হয়েছে বলে এখানে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বেশি কিছু বলছি না।মালদা তথা পশ্চিম বাংলার সব জমিদার বাবুকেই ইংরেজ সরকারকে নির্দিষ্ট দিনে তাহার জমিদারীর রাজস্ব জমা দিতে হত। রাজস্ব না দিতে পারলেই তাহার জমিদারী নিলামে বিক্রী হত।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে এসে প্রায় ২০০ বছর রাজত্ব করে গেছেন। তারাই তৈরী করেছেন জমিদার, ছোট জমিদার, করদ রাজ্য জমিদারদের লেঠেল বাহিনীর কথা, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারদের কথা, প্রজা নিপীড়নের কথা সকলের জানা। চাঁচলের শিশু সাহিত্যিক তথা রসরাজ শিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখেছিলেন "জমিদারের রথ"- বইটি, মালদার বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ গাজোল,আইহো, বুল-বুল চন্ডি এলাকার জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী লিখেছেন লেখক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "লালমাটি" উপন্যাসে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা,কৈবত্ত বিদ্রোহের কথা, কানু, সিধু ও জিতু সাওতালের কথাকে না জানে। কালিয়াচকের রফিক মন্ডলকে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হয়েছিল একথা

ইতিহাস বলে। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। অত্যাচারীদেওয়ান ও নায়েব গনের লেঠেল দ্বারা বাংলায় প্রজা নিপিড়নের মাত্রা ছড়িয়ে সারা বাংলায় দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মনন্বন্তর। লর্ড ওয়ারেন হোস্টিংস ১৭৭৩-৮৫ সালের মধ্যে বাংলায়যে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন। ফলে নতুনভাবে Board of Revenue বা রাজস্ব পর্ষদ গঠন করে নতুনভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করেন।তার নাম করন হয় কালেক্টর। জমিদারদের সাথে নীলামের ভিত্তিতে পাঁচশালা বন্দোবস্ত প্রথার প্রচলন হয় কিন্তু এতে প্রজাদের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় জমি উর্বরতা শক্তির উপর নির্ভর করে আমিনি কমিশনের মাধ্যমে কৃষকদের নানারকম উন্নতির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় পাঁচশালা বন্দোবস্তের পরিবর্তে একশালা বন্দোবস্তের প্রচলন হয় এবং ১৭৮৬ সালে বোর্ড অফ রেভিনিউ গঠিত হয়। লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে কৃষকদের সাথে জমিদারের সম্পার্কের কথা, জমিদারের সাথে ইংরেজ সরকারের দশ (১০) বছরের জন্য চুক্তি করেন যা দশশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। অবশেষে বিভিন্ন আলাপ - আলোচনার মাধ্যমে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ন ওয়ালিশ বাংলায় সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে বাংলাতে এই প্রথা সর্বপ্রথম চালু হয়। (তথ্য ভারত ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস- ডঃ প্রনব কুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুদেব মুখোপাধ্যায়)। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে খাজনা দিতে না পারলে পরের দিন তাহার জমিদারী নীলামে উঠত। এই আইন সূযাস্ত আইন নামে পরিচিত। যা হোক ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সারা বাংলায় ইংরেজ সরকারের খাজনা বা রাজস্ব আদায়কারী বা ইংরেজ এজেন্টরা রাতারাতি হয়ে গেলেন 'জমিদার' তথা জমির মালিক এবং চাষীরা হয়ে গেলেন জমির মালিকানা হারিয়ে প্রজা এবং চাষী। (কী বলবো

থেকেই গেল চাষীর দুঃখ চীরকাল) দশশালা বা চীরস্থায়ী বন্দোবস্তের সব থেকে বড় কুফল হল চাষীরা রোদে বৃষ্টিতে ভিজে জমিতে সোনার ফসল ফলিয়ে লাভের অংশ তুলে দিতে হত অত্যাচারী জমিদারদের হাতে। লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার নানান সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ভারতে আসেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস, রিচার্ড বেকার, জজ ডুকারেল, অ্যাডাম স্মিথ ও মন্টেস্কুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার প্রধান শর্তগুলি ছিল ঃ

১) জমিদার শ্রেণী বংশানুক্রমিক ভাবে জমির মালিকানা ভোগ করবেন।

২) জমিদার গন আদায়ীকৃত রাজস্বের ৯/১০ অংশ কোম্পানীকে জমা দিবেন।

৩) প্রাকৃতিক দূর্যোগ সত্ত্বেও রাজস্বের পরিমান অপরিবর্তিত থাকবে।

৪) বৎসরে নির্দিষ্ঠ দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে কোন জমিদার সরকারী রাজস্ব জমা দিতে না পাড়লে তার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হবে। এবং পরের দিন সেই জমিদারী নিলামে উঠবে।

এই জন্য এই আইনকে সূর্যাস্ত আইন বলা হয়ে থাকে।

১৯৫৩ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলার চাষীদের দুঃর্দশার অন্ত ছিল না। ভারতবর্ষ তথা বাংলার অন্যান্য এলাকার ভূমি রাজস্ব প্রথার নিয়ম মেনেই চাঁচলের জমিদার ঈশ্বর চন্দ্র রায় চৌধূরীর উদ্ভব হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। মালদা জেলায় জমিদারীর ইতিহাসে চাঁচল রাজ এস্টেট এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

W.W. হান্টারের ১৯৭১ সালের এক রিপোর্টে জানা যায়যে হাতিন্ডা পরগনায়একটি নিষ্কর জমি বা লাখিরাজ জমির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল-

১) দেবোত্তর বা গৃহ দেবতার পূজার অন্য জমি,

২) ব্রহ্মত্তোর বা ব্রাহ্মনদের ভরন পোষনের জন্য জমি,

৩) ভাটোত্তোর বা ভাট গায়কদের দেওয়া জমি,

৪) বিষ্ণুত্তোর বা বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশ্যে দেওয়া জমি,

৫) গনৎকোত্তর বা গনৎকারদের দেওয়া জমি,

৬) জোগিদেরদেওয়া জমি,

৭) বৈদ্যোত্তর বা কবিরাজ বৈদ্যদেরকে দেওয়া জমি বা চিকিৎসকদের দেওয়া জমি,

৮) ইনামী বা পুরস্কার হিসাবে দেওয়া জমি,

৯) মন্ডুলান বা গ্রামের মোড়লদের দেওয়া জমি,

১০) মহোত্তরন বা বিভিন্ন পদের লোকদের দেওয়া জমি,

১১) আয়মা বা মুসলিমদেরদেওয়া জমি,

১২) পীরন বা পীরত্তোর-পীরদের দেওয়া জমি,

১৩) ঘাটোত্তর বা ঘাটোয়ালকে দেওয়া জমি,

১৪) ঢাকীদেরদেওয়া জমি এবং ফকিরান বা ফকিরদের দেওয়া জমি এই সমস্ত জমি জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল।

শিবরাম বাবু তাঁর বিখ্যাত পুস্তকটির নাম “ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা” কেন করলেন আমার ব্যক্তিগত মতে যা বলে তিনি ভগবানের (ঈশ্বরের) অর্থাৎ এক অর্থে পরম কল্যানময় ভগবানের তৈরী পৃথিবীতে বা জমিদার ঈশ্বর চন্দ্রের সৃষ্ট চাঁচল জমিদারীতে এসে ভালোবাসা থেকে (ঈশ্বরের করুনাথেকে) এক প্রকার বঞ্চিত-ই হয়েছিলেন। মনের দুঃখে খোদোক্তি করেই নাম করনের যুক্তি হিসাবে বলা যায়। মুর্শিদাবাদের চূয়া গ্রামে থাকলে তাঁদের পরিবার বর্গকে হয়তো এতটা বঞ্চিত হতে হত না। এই রকম নাম করনের

অর্ন্তনির্হিত অর্থ বলতে যা বোঝায়। কারন হিসাবে বলা যায় কবি বারবার তার খোদোক্তির কথা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন।

চাঁচল রাজ পরিবারের বংশ তালিকা

সাবর্ণ রায় চৌধুরী (গণেশ)

ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী

(বড়রাণী সিদ্ধেশ্বরী দেবী, এবং ছোট রাণী ভূতেশ্বরী দেবী)

শরৎ চন্দ্র রায় চৌধুরী

(দত্তক পুত্র, রাণী দাক্ষায়ণী দেবী)

১) সুভাষিণী (স্বামী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

২) ক্ষিরোদ বাসিনী (স্বামী মহেন্দ্রনাথ মুখার্জী)

৩) মৃণালিনী (পুত্র শিশির কুমার মুখার্জী- চির কুমার ছিলেন, ভাগ্না- ভিক্টর ব্যানার্জী- চলচিত্র শিল্পী)

৪) কুমার শিবপদ (স্ত্রী মুক্তকেশী দেবী- ১৯৭৬ সালে পুরীতে মারা যান)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর পুত্র রাসবিহারী ব্যানার্জী।

মহেন্দ্র নাথ মুখার্জীর ছেলে শঙ্কর প্রসাদ মুখার্জী এর পুত্র আশীষ কুমার মুখার্জী। আশীষ কুমার মুখার্জীর তিন পুত্র এবং দুই কন্যা যথা ১) মৃত হরিহর মুখার্জী ২) সঞ্জয় মুখার্জী ৩) সীতারাম মুখার্জী এবং কন্যা ১) কল্যাণী মুখার্জী ও ২) শিবানি মুখার্জী।

চাঁচল শিব বাড়ি মন্দির (রায় পাড়া)

ইতিহাসের পাতায় চাঁচল শিববাড়ি

বর্তমান চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল (মৌজা চাঁচল জে.এল.নং-৭০) সংলগ্ন এলাকাটি ছিল একসময় অর্থাৎ ১৫৫০-১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী চাঁচল পুরাতন জমিদার বাড়ী বা পুরাতন রাজবাটি (Old Raj Palace) একথা সকলের জানা। এই পুরাতন রাজবাড়িতে থাকা কালীন জমিদার ঈশ্বর চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তার জমিদারী পরিচালনা করতেন। বর্তমান চাঁচল রাজবাড়িটি ১৮৭২-১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্যার জন স্টুয়ার্ট লয়েডের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়ীটির কাজ শেষ হয় এবং রাজা শরৎ চন্দ্র রায় বাহাদুর ১৯০৪ সালে গৃহ

প্রবেশ করেন। কিন্তু চাঁচলের রায় পাড়ায় বর্তমান শিব মন্দিরটি (মৌজা সিঙ্গিয়া জে.এল.নং ৬৮) বিগত ১৮৬০ সালে এলাকার স্বনামধন্যব্যক্তি রাধাকান্ত চৌধুরীর পিতা লোকনাথ চৌধুরী মহাশয় এই শিবমন্দিরটি নির্মান করেন। জেলার ঐতিহাসিক ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে এটির গঠন শৈলী খুব চমৎকার এবং অতি মনোরম ছিল কিন্তু মেরামতের অভাবে প্রায় নষ্ট হতে চলেছে। এখানে এক সময় এলাকার জমিদারের পূর্ণ সহযোগিতায় উইলিয়াম মার্শম্যান এবং হ্যালিড সাহেবের যৌথ উদ্যোগে একটি সংস্কৃত টোল বা চতুষ্পাঠি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটি পশ্চিম দিকের অঙ্গন জুড়ে ছিল বেশ কয়েকটি ঘর (পাকাঘর)। কিছু দিন আগে ও ঘরগুলির ভাঙ্গাচিহ্ন অবস্থিত ছিল একদা এই টোলে শিক্ষা গুরু হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন জেলার স্বনাম ধন্য পন্ডিত শ্রী বিধূ শেখর শাস্ত্রী মহাশয়। যিনি পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সেখানেই কবি গুরু রবীন্দ্র নাথের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালেও আমরা দেখেছি মন্দিরের পশ্চিমদিকে ঘরগুলো ভেঙ্গে পড়ছে। এখানে কোন দিন না গেলেও প্রতি বছর বৈশাখ মাসে কীর্ত্তনের দিন খিচুড়ির প্রসাদ খেতে অবশ্যই যেতাম আমরা। ঝুলু কাকুর পুকুর থেকে জল সিঙ্গারা তোলার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে গামছা নিয়ে যেতাম বাবা-মাকে লুকিয়ে। এই কীর্ত্তনের আসর আজ রায় পাড়ার প্রতিটি মানুষের কাছে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের পুত্র (Adapted Son) রাজা শরৎ চন্দ্রের জমিদারীর সহযোগিতায় সংস্কৃত টোলটির পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করতেন। "The Statistical Account of Bengal of Maldah" বইটি থেকে জান যায় যে এই টোলের গুরু মহাশয়গণ ছিলেন বেশির ভাগ হিন্দু বা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মন সম্প্রদায় ভূক্ত। এখান কার গুরুমহাশয় গণের মাসিক বেতন ছিল ১১(এগার) টাকা মাত্র। জমিদার মহাশয়ের দেওয়া নিস্কর ভূমি (Rent free land) ভোগ করতেন তাদের সংসারের ব্যয় ভার বা ভরনপোষনের জন্য।

বিখ্যাত ইংরেজ ডঃ বুকানন হ্যামিলটন-এর লেখা ১৮১০ সালের এক রির্পোটে জানা যায় সেদিন সারা জেলায় মাত্র ২০ (কুড়ি) টি পাঠশালা সংস্কৃত টোল বা

চতুষ্পাঠি ছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করলে ও ১৮১০ সালের আগে পর্যন্ত মালদা জেলায় ইংরাজী শিক্ষার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে। রায় পাড়ার এই টোল বা চতুষ্পাঠি টিছিল খুব প্রাচীন এবং নাম করা। দীর্ঘ দিন ধরে এই টোলটি জেলার শিক্ষার অঙ্গনে এক বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এই টোলে সংস্কৃত ভাষা তথা পাটিগণিত শেখানো হতো। এছাড়াও এখানে বাংলা এবং হিসাব শাস্ত্র বিষয়টিও ছাত্রদের শেখানো হতো। ৫ বছর বয়সের শিশুরা এই টোলে বা চতুষ্পাঠি লেখাপড়া শিখতে আসতো। ছয় মাসের মধ্যে শিশুদের বর্ণমালা শিক্ষা শেষ হলে পরবর্তী কালে উপরের বিষয়গুলি শেখানো হতো। আর্থিক দিক দিয়ে সম্পন্ন বা বিত্তশালী পরিবারের ছেলেরাই কেবল এখানে লেখাপড়া করতো। সেই সময় শতকরা এক ভাগ মুসলিম পরিবারের ছেলেরা এই টোলে লেখাপড়া করতে আসতো। কোন কোন জায়গায় মক্তব বা ফারসী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেই সময় অর্থাৎ ১৭৮০-১৮১০ সালের মধ্যে এলাকায় মুসলীম ছাত্রদের আরবী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। পরবর্তী কালে এলাকার স্বনাম ধন্য রাজা শ্রী শরৎ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই টোলটি চলতে থাকে এবং তাহার এক মাত্র পুত্র কুমার শিবপদ এর নামানুসারে নতুন নাম করণ হয় "শিবপদ চতুষ্পাঠি" The Malda Distrit Gazeteer By- J.C. Sengupta এর Education Chapter এর রিপোর্টে জানা যায় ১৮৬৯ সালে মালদা জেলায় হাতে গোনা মাত্র ১০ (দশ) টি চতুষ্পাঠি বা টোল ছিল

যেমন—

১) বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠি— মালদা। ২) অভয় চতুষ্পাঠি — মালদা। ৩) জ্যোতির্ম্ময়ী চতুষ্পাঠি — মালদা। ৪) বিনা পানি চতুষ্পাঠি — মালদা। ৫) কিশোরী মোহন চতুষ্পাঠি — মালদা। ৬) চাঁচল শিবপদ চতুষ্পাঠি — রায়পাড়া/চাঁচল। ৭) চতুষ্পাঠি — মোথাবাড়ি। ৮) বংশী কুমুদিনী চতুষ্পাঠি — মালদা। ৯) আড়াইডাঙ্গা নবীন চতুষ্পাঠি — আড়াইডাঙ্গা। ১০) নওঘরিয়া চতুষ্পাঠি — নওঘড়িয়া

সরকারী ভাবে প্রথম মালদা জেলায় ১৮৬০-৬১ সালে প্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হয়। চাঁচলের এই টোল টিতে গুরু মহাশয় গন ছাত্রদের খুব যত্ন নিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন। পাটিগণিতের অঙ্ক দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল যাহার প্রথমটি ছিল চাষবাস (Agriculture) এবং দ্বিতীয়টি ছিল ব্যবসা বানিজ্য (Commercial) সংক্রান্ত। টোল পন্ডিতগণের মুখে শোনা যায় এখানে সংস্কৃত সাহিত্যের আদ্য, মধ্য ও পূর্ণ (কাব্য) এই তিনটি বিষয় যত্ন নিয়ে ছাত্রদের পড়ানো হতো। বিভিন্ন (Report) থেকেজানা যায় যে প্রতিটি টোলে প্রতিবছর ২০ জন করে শিশু কে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্ত্তি নেওয়া হতো । এই মন্দিরের দক্ষিণে যে উঁচু জায়গাটিতে বর্তমানে রামকৃষ্ণ পল্লী গড়ে উঠেছে জমিদার আমলে এই এলাকাটিতে রাজা বাহাদুর খুব নামী দামী এবং মূল্যবান গাছ লাগিয়ে ছিলেন সংস্কৃত টোলটির শোভা বর্দ্ধনের জন্য। এখানেই ছিল রাজার খয়ের বাগান আর ছিল একটি দারুচিনি বা ডালচিনির গাছ। এক দিন একটি ছেলে এই ডালচিনির গাছে মুখ লাগিয়ে কামড়ে কামড়ে গাছের ছাল বা খোলস চামড়াগুলি খেতে থাকে। কারণ এই গাছের ছাল খেতে খুব সু-স্বাদু যুক্ত মিষ্টি ঝাল লাগে। রাজ বাড়ীর ছাদে প্রতিদিন বৈকালে রাণীমা পায়চারী করতেন। ছেলেটির কান্ড দেখে রানীমার হুকুমে পরের দিন সকালেই প্রহরীরা এসে ডালচিনির গাছটিকে কেটে ফেলা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়

এলাকার জনহিত কর এবং প্রজা মঙ্গল কামী রাজা শরৎ চন্দ্র রায় চৌধূরী মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রজাদের রোগ থেকে মুক্তি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে - **"ঈশ্বর চন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়"**- নামে একটি হাস পাতাল তৈরী করেন। এছাড়াও তিনি তাহার জমিদারী এলাকার সম্বলপুর, সামশী, শ্রী চন্দ্র পুর, গোহিলা, কোকলমারী এবং খরবা- পুলিশ থানা

এলাকায় ১টি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলেন। প্রতিটি হাস পাতালে একজন করে L.M.E. ডাক্তার এবং একজন করে কম্পাান্ডার-এর ব্যবস্থা করেন। আর দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না কারন খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে ত্রিশ (৩০) পর্বে সমাপ্ত "চাঁচলের ইতিহাস"— বইটি। এই বইটিতে থাকছে বিগত ৪০০ বছরের লুপ্ত ইতিহাস যেখানে জানা যাবে রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের কথা, শরৎ চন্দ্রের কথা, চাঁচল এষ্টেটের জন্মকথা, কবি শিবরামের কথা তিনি কেন লিখলেন জমিদারের রথ বইটি চাঁচলের পূর্ব নাম চাঁচড়/চাঁচর কেন ছিল। মরা মহানন্দার কথা, চাঁচলের ফেরীঘাটের কথা, ওল্ড রাজ প্যালেসের কথা, চাঁচলের পীর সাহেব বা ফকির সাহেব বা "পীর আখি সৈয়দ আসেরী শাহ" এর কথা সব মিলে ত্রিশ পর্বে সমাপ্ত হতে চলেছে "চাঁচলের ইতিহাস বইটি" এখানে একটি পর্বের সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল। বিগত প্রায় ৭/৮ বছর ধরে রায় হস্‌পিটাল পাড়া ও রামকৃষ্ণ পল্লীতে উৎসাহী যুবকবৃন্দ এবং নবীন সংঘের পরিচালনায় এখানকার দুর্গাপূজাটি প্রতিবছর নতুন নতুন সিনারী প্রদর্শনের মাধ্যমে চাঁচলের দর্শকদের মনোরঞ্জন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। পূজা কমিটির সকলে আমাকে সর্বতো ভাবে সহ-যোগিতার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের কথা আমার লেখায় অবশ্যই জায়গা পাবে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সুকান্ত পল্লীবাসীর পক্ষ থেকে এবং Rotary Club of Chanchal এর পক্ষ থেকে এই পূজা পরিচালন কমিটির সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং শারদীয়ার অভিনন্দন।

যে সমস্ত পুস্তক এবং যারা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের কাছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ঋণী।

— মেঘনাদ দাস
চাঁচল।

তথ্য সহায়ক পুস্তকাবলী

১) চাঁচলের শরৎ চন্দ্র- ভূপেন্দ্র নাথ দাশ

২) Malda District Gazeteer- J.C. Sengupta 1969

৩) Malda District Gazeter- G.E. Lamburn- 1810

৪) A Statistical Report of Bengal- W.W. Huntu (Voll-Vn, Dist-Malda, Rangpur and Dinajpur (London -1868)

৫) The History of Bengal- R.C. Majumder (Dacca-1943) Vol-I

৬) Final Report on the Survey and Sattlement operation in to the District of Maldah- (1928-35) M O. carter.

৭) মালদা জেলা সমগ্র- আব্দুস সামাদ

৮) অতীতের মালদহ- প্রবাল রায় (১৯৯০)

ঃ আমার ব্যক্তি ঋণ ঃ

দিপঙ্কর দাস (ভাগ্নাবাবু) - ইতিহাস শিক্ষক - সিদ্ধেশ্বরী স্কুল।

শুভময় গোস্বামী -(ভ্রাতৃসম) - বাংলা শিক্ষক- সিদ্ধেশ্বরী স্কুল।

অনিরুদ্ধ সাহা (বন্ধুবর)- বাংলা শিক্ষক- সিদ্ধেশ্বরী স্কুল।

ফরিদ আলী (ভ্রাতৃসম) - ভূগোল শিক্ষক - সিদ্ধেশ্বরী স্কুল।

চাঁচলের রোটারিয়ান বন্ধুগণ, রোটারিয়ান দাদা ও ভাইয়েরা।

জগন্নাথচৌহান ও প্রশান্ত পাল (নবীন সংঘ)
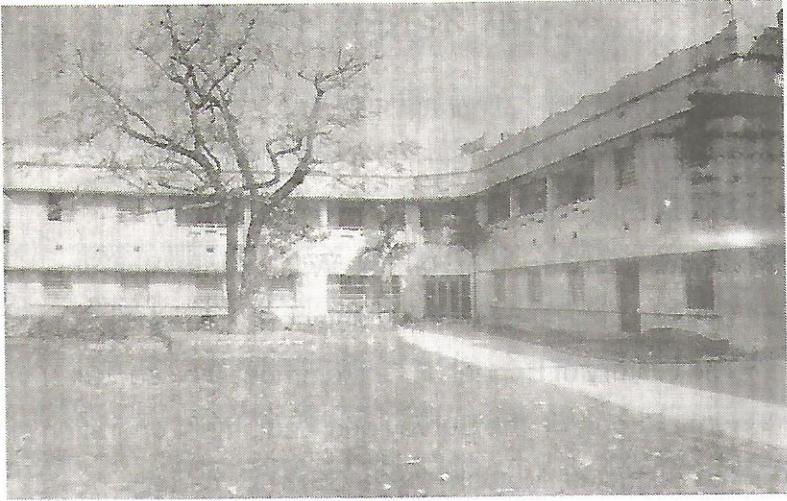
সিদ্ধেশরী নিউ বিল্ডিং- ১৯৬০

চাঁচলের শিক্ষাঙ্গনে শিবপদ চতুষ্পাঠি ও সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়

১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ডঃ বুকানন ফ্যান্সিন হ্যামিলটন যে বিশাল তথ্য রেখে গেছে আজকে সেই তথ্যাবলী ইতিহাস, ভূগোল গবেষকদের কাছে তার মূল্য অপরিসীম। ১৮১৩ সালে মালদা জেলা সৃষ্টির আগে অর্থাৎ সরকারী ভাবে ১৭৬৫ সালের পর থেকে ১৮১০ সাল পর্যন্ত পূর্ণিয়া বা রাজশাহী বা মালদা জেলায় ইংরাজী শিক্ষার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৬০ সাল নাগাদ মালদা জেলায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। জেলা শহর বাদ দিলে গ্রামীন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল গ্রামীন পাঠশালা বা সংস্কৃত টোল বা চতুষ্পাঠি। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝির দিকে উইলিয়াম মার্শম্যান ও হ্যালিড সাহেবের যৌথ উদ্যোগে এবং চাঁচল জমিদার বাবু অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধূরীর পূর্ণ সহযোগিতায় রায় পাড়ায় বর্তমান শিব মন্দির প্রাঙ্গনে একটি সংস্কৃত টোল বা চতুষ্পাঠির (পরবর্তীকালে চাঁচল শিবপদ চতুষ্ঠাটি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ সালে এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তি কলিগ্রামের রাধাকান্ত

চৌধূরীর পিতা শ্রীযুক্ত লোকনাথ চৌধূরী মহাশয় এখানেই একটি খুব সুন্দর শিব মন্দির নির্মান করেন। জেলার ঐতিহাসিক ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে এটির নির্মান শৈলী খুব চমৎকার ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে প্রায় নষ্ট হতে চলেছে। মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে ঘর গুলিতে বসেই গুরু মহাশয়গন এই টোলে শিক্ষা দান করতেন। একসময় এই টোল বা চতুষ্পাঠিতে শিক্ষা গুরু হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন জেলার স্বনামধন্য ব্যক্তি পন্ডিত শ্রী বিধূ শেখর শাস্ত্রী মহাশয়। যিনি পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সেখানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন। (সংস্কৃত টোল বা শিবপদ চতুষ্পাঠি পর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে বলে এখানে সমাপ্ত করছি) টোলের গুরুকুল বা অধ্যাপক গন এলাকার বিশিষ্ঠ ব্রাহ্মান সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। জেলার শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন-

These chatuspathis used to be maintained by Adhyapakas who were drawn by generally from the Brahman caste. Malda District Gazeteer by J.C. Sengupta Page 203

অভিভক্ত মালদা জেলায় ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সর্ব প্রথম স্যার জর্জ ক্যাম্বেরেলস যোজনার মাধ্যমে পাঠশালায় গুরুকূলদের মাসিক ৫টাকা হারে অনুদান দিতে আরম্ভ করে। তার পূর্বে স্থানীয় জমিদার বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর্থিক সহযোগিতায় টোল বা চতুষ্পাঠি গুলি চলছিল। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে District Board গঠিত হলে প্রাথমিক শিক্ষাদান কেন্দ্রগুলিকে "Bengal self Government" এর আওতায় আসে। ১৮৬৯ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে মালদা জেলায় যে দশটি নাম করা চতুষ্ঠাটি ছিল সে গুলির নাম নিম্নরূপ।

১) বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠি - মালদা

২) অভয় চতুষ্পাঠি - মালদা

৩) জ্যোতির্ময়ী চতুষ্পাঠি - মালদা

৪) বিনাপানি চতুষ্পাঠি- মালদা

৫) কিশোরী মোহন চতুষ্পাঠি-মালদা

৬) চাঁচল শিবপদ চতুষ্পাঠি - চাঁচল (রায়পাড়া শিববাড়ি)

৭) মোথাবাড়ি চতুষ্পাঠি - মোথাবাড়ি

৮) আড়াইডাঙ্গা নবীন চতুষ্পাঠি- আড়াইডাঙ্গা

৯) বংশী কুমোদিনী চতুষ্পাঠি - মালদা

১০) নওঘড়িয়া চতুষ্পাঠি- নওঘড়িয়া।
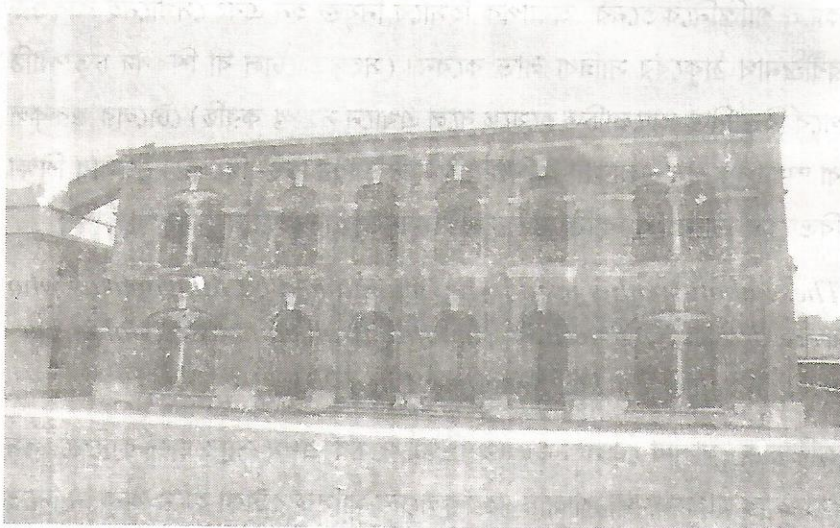
এটি রাজা শরৎচন্দ্র ব্লক (পূর্বের কাচারী বাড়ি)

RAJASARATCHANDRA
BLOCK
GIFTED BY :—
SRI SANKAR PRASAD
MUKHERJEE
CHANCHAL, MALDA
1960

সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের জন্মকথা
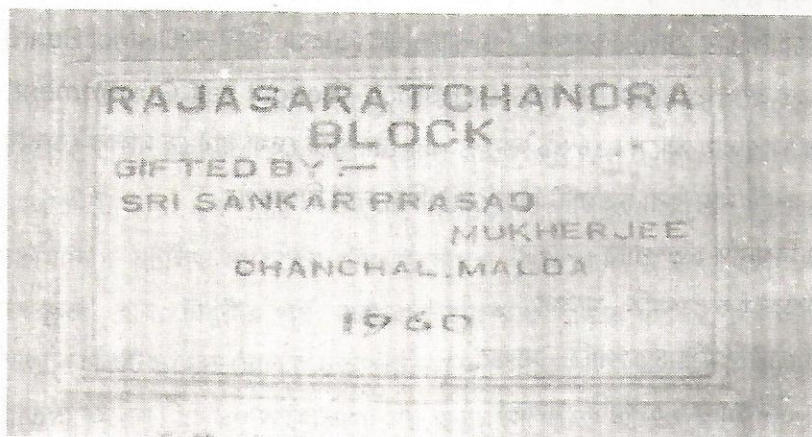
বর্তমান চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল সংলগ্ন এলাকাটি ছিল Old Raj Palace বা পুরাতন রাজবাটি শিবরামের কথায় "একটা রাজা ঈশ্বর চন্দ্র রায় চৌধূরী এই বাড়িতে থাকা কালীন তাহার জমিদারী কার্য্য পরিচালনা করতেন। গৌড়হন্ড, রোকনপুর এবং হাতিন্ডা বা হান্দিকান্দা পরগনাকে নিয়ে তাহার বিশাল পরিমান এলাকা জুড়ে ছিল জমিদারী বা চাঁচল রাজ এষ্টেটের সীমানা। রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের দুই রানী ছিলেন বড়রানী সিদ্ধেশ্বরী ও ছোট রানী ভূতেশ্বরী। বড়রানী অ-পুত্রক ছিলেন বলে জমিদার বাবু ভূতেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেন। ছোটরানীর কোন পুত্র সন্তান না থাকলেও তিনি তিন (৩) কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। তাদের নাম ছিল ১) সুভাষিনী ২) খিরোদ বাসিনী ও মৃনালিনী যথাসময়ে এই তিন কন্যার বিয়ে দেন এবং বয়সকালে রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের ব্যবস্থা মত বড়রাণী না পারলে ছোটরানী দত্তক নিতে পারবেন এই ব্যবস্থা করে গেছিলেন। রাজবাড়ীর কুলজী নামা ও বিভিন্ন তথ্য থেকে যে টুকু জানা যায় মুর্শিদাবাদের নীমতীতা গ্রাম থেকে মধূসূদন রায়ের ৫ বছরের এক ব্রাহ্মান সন্তান (শরৎচন্দ্র) কে সরকারী ভাবে দত্তক গ্রহন করেন। রাজা শরৎ চন্দ্রের জন্ম আনুমানিক ১৮৬৫ সাল এবং তার ৫ বছর বয়সে ১৮৭০ সালের নভেম্বর মাসে মালদা থেকে H.R. Reily নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক কে চাঁচল রাজ এষ্টেটের নাবালকের নামে জমিদারী দেখাশোনার জন্য কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস (Court of words) নিযুক্ত করেন এ কথা সকলের জানা। মি. র‍্যালি সাহেব ১৮৭০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১ বছর চাঁচলের জমিদারী দেখাশোনা করেন এবং বড়রানী সিদ্ধেশ্বরীর সাথে সহযোগিতা করে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, জল ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক বিশাল অবদান রেখে গেছেন তাদের কথা আলাদা পর্বে আলোচিত হয়েছে বলে মূল পর্বে ফিরে আসছি। (অ-প্রাসঙ্গিক হলেও এটুকু আলোচনা না করে পারলাম না)।

যা হোক J.C. Sengupta— এর জেলা গেজে টিয়ারে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের স্থাপনাকাল ১৮৮৫ সাল দেখানো হয়েছে কিন্তু প্রকৃত তথ্য অনুধাবন করলে দেখা যায় বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রাইমারী বিভাগের উত্তর দিকে খড়ের বা

টিনের ঘরগুলিতে অর্থাৎ পুলিশ ব্যারাকে ১৮৭৪-৭৫ সাল থেকে প্রাথমিক এবং পরবর্তী তে মাধ্যমিক স্কুল বা ইংরাজি স্কুল চালু হয়ে যায়। ১৮৮৮ সালের ১৬ই আগষ্ট বড়রানী সিদ্ধেশ্বরীর জন্ম দিনটিকে চীর স্মরনীয় করবার জন্যই আনুষ্ঠানিক ভাবে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়টি "চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন"- নামে কাগজে কলমে আরম্ভ হয়ে যায়। পূর্বে যাহার নাম ছিল চাঁচল হাইস্কুল পরে তাহা Chanchal Siddheswari Institution এ পরিনত হয়। অবিভক্ত বাংলার এবং রাজশাহী, দিনাজপুর ও মালদা জেলায় যে ছয়টি স্কুলের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হলো নিম্নরূপ—

১) মালদা জেলা স্কুল- ১৮৫৮

২) ওল্ড মালদা কে.সি. হাইস্কুল-১৮৫৯

৩) আড়াইডাঙ্গা ডি.বি. মডেল অ্যাকাডেমি-১৮৭০

৪) মথুরাপুর বি.এস.হাইস্কুল-১৮৭০

৫) চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন-১৮৮৫

৬) শিবগঞ্জ হাইস্কুল-১৮৯০

যা হোক রাজা বা জমিদারী না থাকলেও চাঁচল রাজ এষ্টেট থেকে এখনও প্রতিমাসে ৫০০.০০ টাকা করে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসিয়াল ট্রাস্টি বোর্ড থেকে এখনও ৫০০X১২ মাস অর্থাৎ বছরে ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয় কে দেওয়া হয়ে থাকে।

সিদ্ধেশ্বরী স্কুলটি সম্পর্কে-

J.C. Sengupta The Malda District Gazteer এ লিখেছেন "The Chanchal Siddheswari Institution was established in August 1888 as a High English school by Raja Sarat Chandra Roy Choudhury Bahadur of Chanchal in memory of his mother, Rani Siddheswari Debi Chaudhurani. The entire capital and recurring costs for the school used to be borne by the Raj estate of chanchal and grants

are still regularly received from the estate funds. The school was recognized by the calcutta university in the year 1899. It was granted Permission to teach science in 1947. It was up graded into a Higher Secondary School with Humanities, Science and Technical courses from 1959.

তখনও হলুদ দোতালা বাড়ি (New Building) ছিল না। পেছনের লম্বা দুই সারি সাতটি (৭) করে ১৪টি এবং সীতারাম সাহার (প্রধান শিক্ষক) প্রাইমারীর দিকে ৭টি মোট ৭ + ৭ +৭ = ২১ টি ঘর ও আম গাছের পাশে অফিস ঘরকে নিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগটি চালু হয়। বর্তমানে দক্ষিণ দিকের ৭ টি ঘর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং এখানে ডি.পি.ই.পি.-র টাকায় প্রথমে ২টি বড় ঘর, ওপরে সিড়িঘর ও দোতালা গৃহ নির্মান কাজ চলছে। উত্তর প্রান্তের ইন্দারার পাশে ৭টি ঘরের মধ্যে আরবী ছাঁদ দেওয়া বারান্দা ২০০১ সালের ৪ঠা অক্টোবর মাসে প্রবল বর্ষনে প্রায় ১৫ ফিট লম্বা বারান্দাটি স্কুল চলাকালীন ভেঙ্গে পড়ে ফলে ষষ্ঠশ্রেণীর চারজন ছাত্র চাপা পড়ে যায়। হীরালাল সাহা ও মিঠুন ঘোষ নামে দুটি ছাত্র সুস্থ হলে ও সুরজিৎ চক্রবর্তী নামে একটি ছাত্র গুরুতর ভাবে আহত হয় এবং তিনদিন পর মালদা হাসপাতালে তার অকাল মৃত্যু ঘটে। সুরজিৎ চক্রবর্তীর অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক ভাবে মর্মাহত এবং আমরা মঙ্গলময় ইশ্বরের কাছে তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

এলাকার দানবীর রাজা এবং রাজ এষ্টেটের আর্থিক সহযোগিতায় স্কুলটি ভাল ভাবে চলতে থাকে। মালদা জেলার শিক্ষার অঙ্গনে ভালো লেখাপড়া হত বলে১৮৯৯ সালে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে স্বকৃতি পায় এবং ১৯০১ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। এই বছর থেকে বিদ্যালয়টিতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়ে যায়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন দেবীচরন অধিকারী ও শশীভূষণ ভট্টাচার্য। বিদ্যালয়টি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বিকৃতি পেলেও রাজ এষ্টেটের অর্থাৎ রাজা শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুরের আর্থিক সহযোগিতায় এবং

পৃষ্টপোষকতায় চলছিল। বিদ্যালয়টি যাতে আরো ভালো ফলাফল করতে পারে তার জন্য রাজা শরৎচন্দ্র দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকামাখ্যা চরন নাগকে মাসিক ২০০ (দুইশত) টাকা বেতনে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন। ১৯১৪ সালে তাঁহার সু-পরিচালনায় বিদ্যালয়টি প্রভূত উন্নতি লাভ করে। ১৯১৪-১৯১৮ সাল প্রায় ৫ বছর এই বিদ্যালয়কে তিনি তার দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার বহর বৃদ্ধির জন্য সর্বাঙ্গীন প্রয়াস চালান। জেলার শিক্ষাঙ্গনে ভালো লেখাপড়ার চর্চাকেন্দ্র হিসাবে বিদ্যালয়টি ক্রমশ সুখ্যাতি অর্জন করতে থাকে। কামাখ্যা বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়টিকে কলেজে উন্নীত করবার কিন্তু রাজ এষ্টেটের ম্যানেজারের সঙ্গে মতের কিছু অমীল দেখা দেওয়ায় এই লোকটি মনের দুঃখে পদত্যাগ করে নিজগৃহে চলে যান। কিন্তু এই সময় কাল মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ছাত্রের জন্ম হয় এই বিদ্যালয়ে। যেমন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি (১) ভাতের জন্মকথা (২) ভাবের জন্মকথা (৩) পরগাছা এই তিনটি বই লেখে এলাকায় বেশ সুনাম অর্জন করেন। এই বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে তিনি কোলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যান এবং পরবর্তীকালে রবিঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে "**রবিরশ্মি**"- নামে প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড ২টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। শিবরাম চক্রবর্তীর কথা আর কী বলব। এই রসরাজ রাজা (মুকুটহীন) বা রস সাহিত্যিক ব্যক্তিটি ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধিজী ও দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুপ্রেরনায় এসে নিজের লেখা পড়া শেষ না করেই বিদ্যালয় ও চাঁচল পরিত্যাগ করে চিরতরে কোলকাতায় চলে যান। কবি শিবরাম বাবুকে নিয়ে বলার অনেক আছে প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে অন্য দিকে যাবো না বলে বেশি কিছু না বলাই ভালো। কিন্তু এই সময় কাল মধ্যে যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ছাত্রটি এই বিদ্যালয়ে এসেছিলেন তাঁর কথা একটু না বলে পারছি না। কোনও ভূল ব্যখ্যা বা ভূল ইতিহাস লেখার সৎসাহস আমার নেই এই মহান ছাত্রটির নাম গিরিজা মুখার্জী বইটির নাম "মালদা জেলার ইতিহাস চর্চা" লেখিকা সুষ্মিতা সোম অধ্যাপিকা গৌড় মহাবিদ্যালয় মালদা পাতা- ৭২ থেকে হুবহু তুলেদিলাম।
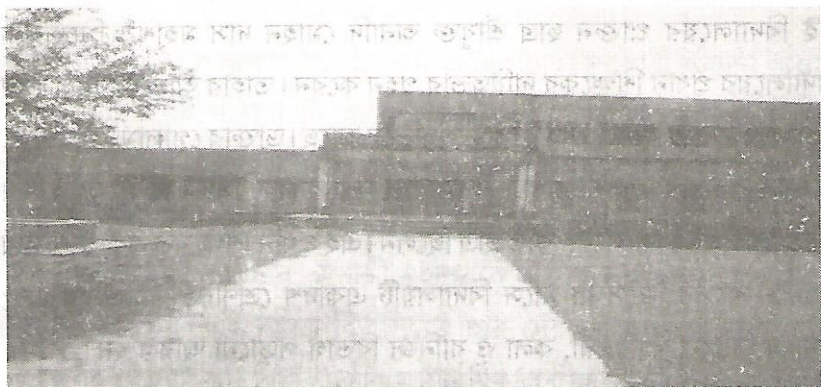
সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের মুক্ত মঞ্চ (এইচ. এস. সেকসেন)

গিরিজা মুখার্জী

"গিরিজা মুখার্জী ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের এক জন একনিষ্ঠ কর্মী, তিনি মালদহ জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। যতদুর সম্ভব স্বাধীনতার কোন ও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারনে তাকে মালদহ জেলা স্কুল ছাড়তে হয়। তিনি চাঁচল সিদ্ধেশ্বরীতে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সবার অলক্ষ্যে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখান থেকেই স্বাধীনতার কাজকর্ম চালাতে থাকেন। ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বেঠকে তিনি গান্ধিজীর সঙ্গে যোগ দেন। অথচ তিনি একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী ছিলেন একথাও খুব জোড় দিয়ে বলা যাবে না। কারণ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বার্লিনে উপস্থিত হলে এই গিরিজা মুখার্জিই নিজস্ব উদ্যোগে হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর যোগাযোগ করিয়ে দেন।" বইটির প্রকাশক-দিপালী পাবলিশার্স চাঁচল মালদা। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসছি ১৯১৮ সালে কামাখ্যা চরন নাগ চলে গেলে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতিছাত্র শ্রীযুক্ত কান্তি ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। কান্তিবাবুর আমলে খুব ভালো লেখাপড়া হত বলে পরপর (লাগাতার) ৮ (আট) বছর মালদা জেলায় District Scholarship পায় চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী স্কুল থেকেই। কান্তি বাবুর অবসরের পরে ১৯৪৫ সালে

এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত অনাদি মোহন দাস মহাশয় সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। তাহার আমলে খরবা তথা চাঁচলের আনাচে কানাচে বহু কৃতি ছাত্র ছড়িয়ে আছে। ডাক্তার গোলাম ইয়াজদানী, ডাক্তার কুলদা কান্ত সরকার, ডাক্তার রঞ্জন সরকার, সিদ্দনাথ সুকুল ইহারা প্রত্যেকেই এই বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন। এই প্রধান শিক্ষকের একান্ত চেষ্টায় ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়টি একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং এখানে বিজ্ঞান, কারিগরী, কলা ও বানিজ্য বিভাগ পড়ানো আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালের ১০ ই এপ্রিল রাজা শরৎ চন্দ্র কলকাতার আনোয়ার শাহ ষ্ট্রীটে মারা যান ফলে রাণী দাক্ষায়নীর দৌহিত্র অর্থাৎ দ্বিতীয় কন্যার সুযোগ্য পুত্র শ্রী যুক্ত শঙ্কর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহার দাদুর (মাতামহ) স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি নতুন ব্লক অর্থাৎ ইউরোপিয়ান গেষ্ট হাউস, মহাফেজ খানা এবং কাচারী বাড়ী (বর্তমান অফিস ঘর - টালির বারান্দা সহ) সহ দেওয়ালের বাহিরের খেলার মাঠ ও সুইমিং পুল পুকুর সহ মোট (৯) বিঘা জমি সিদ্ধেশ্বরী স্কুলকে দান করেন। তিনি চেয়েছিলেন একটি Block রাজা শরৎ নামে থাকবে এবং কারীগড়ি বিভাগ টি চালু হবে। পরবর্তীতে কারীগরি বিভাগ চালু হলে Mecanical Engineer কোর্সটি চালাবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে ১৯৫৮ সালে নগদ ২,৭৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করেন এবং ৩৪,৩৭৫ টাকা খরবা বাসী ও চাঁচলের গন্য মান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে চাঁদা স্বরূপ তোলা হয়। বর্তমান হলুদ বাড়িটির New Building নির্মান কাজ ১৯৬১ সালে আরম্ভ হয়ে ১৯৬৩ সাল নাগাদ কাজ শেষ হয়। ১৯৬৩ সাল নাগাদ সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে ঘরের শঙ্কুলান না- হলে বর্তমান H.S. Section টি অর্থাং চাঁচল এষ্টেটের ইউরোপিয়ান গেষ্ট হাউস টি এবং পাশের টালির বারান্দা সহ Record Room (রেকর্ড রুম) টি নগদ ৩০,০০০ টাকা (ত্রিশ হাজার) টাকায় রাজ এষ্টেট থেকে কিনে নেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ৫২৩ জন। মাধ্যমিক পর্যায়ে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে মানবিকতা বিভাগে ৯৭ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ৬৮ জন, কারিগরী বিভাগে ২৬ জন ছাত্র ছিল। বাকী ৩৩২ জন ছাত্র পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী

পর্যন্ত।১৯৬২ সালে স্কুল লাইব্রেরীর জন্য ৩২৮১ টাকা সরকারী অনুদান পাওয়া গেলে বিদ্যালয়ের পাঠাগারটি আরো সুন্দর ভাবে সাজানো হয় কিন্তু স্কুলের পাঠাগারটি রাজা বাহাদুরের পৃষ্টপোষকতায় আগে থেকেই বেশ পুষ্ট ছিল। এই সময় পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা দাড়ায় মোট ১৬৫০টি বই। পাঠাগারটির সু - পরিচালনার জন্য সত্যচরন মুখার্জী মহাশয়কে মাসিক ২০ টাকা ভাতা দিয়ে নিয়োগ করা হয়। এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র দের খেলা ধূলার জন্য রাজা বাহাদুরের দেওয়া ১৮ বিঘা খেলার মাঠটি বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। এই মাঠে তিনটি ফুটবল মাঠ ও ১টি ভলিবল মাঠ বিদ্যমান ছিল। শিক্ষা জগতে কালের পরিবর্তনে Entrance ও Matriculation এর যুগ শেষ হলে ১৯৫৮ সালে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয় পুরাতন একাদশ শ্রেণীতে (Old H.S.) উন্নীত হয়। এই সময় এখানে বিজ্ঞান, কলা, কারিগরী ও বানিজ্য বিভাগ চালু ছিল। ১৯৭৫ সালে পুরাতন H.S. এর প্রথা বিলুপ্ত হলে ১৯৭৬ সালে সারা পশ্চিম বঙ্গে নতুন ১০ ক্লাশে মাধ্যমিক এবং ১০ + ২ (দ্বাদশ) ১২ ক্লাশে নতূন উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের নিয়ম অনুযায়ী Higher Secondary Examination এর অনুমোদন পায়।

(Memo No. 69) 75-76 এর Dt. 25/10/76 এই আবেদন মূলে West Bengal council of H.S. Education এর 1st Recognization অনুযায়ী Memo No. 2336 dt. 28/04/76 তে H.S. (10+2) Science, Arts & Commerce পড়ানোর অনুমতি পায় ১২ টি বিষয় সহ) এই বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ গোস্বামী মহাশয়, ব্রতচারী বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং প্রয়াত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় (প্রাথমিক বিভাগ) দুই জনেই আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন। (আমি ১৯৬৯ - থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম) তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং ছাত্রদের প্রতি আপত্য স্নেহ আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে : অমরেন্দ্র নাথ মজুমদার, অমলেন্দু শেখর রক্ষিত, কালী বাগচী, দেবদাস চ্যাটার্জী, অখিল কুমার কর্মকার, অচিন্ত কুমার সরকার (সদ্য অবসর

প্রাপ্ত), জ্যোর্তিময় দাস, তরিৎ কুমার সরকার, উৎপল কুমার মজুমদার ও সুবিমল নন্দী বাবুদের শিক্ষাদানে আমি মুগ্ধ হয়েছি। হরিপদ বাবু ও সতীশ বাবুর শেখানো বুলি আজও আমার মনে পড়ে।

" পাখি সব করে রব রাতি পোহায়িল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।"

— ছোট বড় সব মান -অভিমান ভূলে গিয়ে আমাদের শিখিয়েছিলেন ।

"চল্ কোদাল চালাই ,
ভুলে মানের বালাই।"

সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের হেরিটেজ বিল্ডিং গুলোকে দেখে যতদুর অতীতের কথা মনে হয়েছে তার স্মৃতি চারন করবার চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার নিজস্বতা আর জ্ঞানের পরিসর খুবই নগন্য। ২০০৭ এর সরস্বতী পূজায় বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষক (ইতিহাস) দীপঙ্কর দাস (ভাগ্নাবাবু), সৌরভ রায় ইতিহাস শিক্ষক ও বাংলা শিক্ষক শুভময় গোস্বামী (সকলে ভ্রাতৃসম) একান্ত চেষ্টায় ও অনুপ্রেরনায় "ইতিহাসের পাতায় সিদ্ধেশ্বরী" নামে একটি লেখা দেওয়ালে টাঙানো হয়েছিল। ২০০৮ সালের দূর্গাপূজায় চাঁচল রায় পাড়ায় মহাঅষ্টমী, নবমী ও দশমীতে টাঙানো হয়েছিল "ইতিহাসের পাতায় চাঁচল শিববাড়ি"— নামে একটি লেখা। যাদের অনুপ্রেরনায় এবং সহযোগিতায় আমার এই প্রয়াস আমি তাদের কাছে চীর কৃতজ্ঞ।

সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের বিগত দশ (১০) বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল দেওয়া হল।

মাধ্যমিক বিভাগের ফলাফল

মাধ্যমিক ১৯৯৯ — ফলাফল	মাধ্যমিক ২০০০ — ফলাফল
মোট পরীক্ষার্থী- ৮২ জন	মোট পরীক্ষার্থী- ৯৪ জন
প্রথম বিভাগ - ৩৬ জন	প্রথম বিভাগ - ১৫ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৩২ জন	দ্বিতীয় বিভাগ- ২৬ জন

তৃতীয় বিভাগ- ৬ জন
স্টার-৬ জন

তৃতীয় বিভাগ- ১৩ জন
স্টার-৩ জন

মাধ্যমিক ২০০১ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ৮৭ জন
প্রথম বিভাগ - ২১ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৩৪ জন
তৃতীয় বিভাগ- ৫ জন
স্টার-৭ জন, সর্বোচ্চ-৬৫৯

মাধ্যমিক ২০০২ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ১০১ জন
প্রথম বিভাগ - ২৮ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৪২ জন
তৃতীয় বিভাগ- ০৫ জন
স্টার-৮ জন, সর্বোচ্চ- ৭৩৬

মাধ্যমিক ২০০৩ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ৭৯ জন
প্রথম বিভাগ - ৩০ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৩৯ জন
তৃতীয় বিভাগ- ৪ জন
স্টার-৮ জন, সর্বোচ্চ-৭৪৭

মাধ্যমিক ২০০৪ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ৮৮ জন
প্রথম বিভাগ - ৩২ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৪৯ জন
তৃতীয় বিভাগ- ৪ জন
স্টার-১১ জন, সর্বোচ্চ- ৭১৪

মাধ্যমিক ২০০৫ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ১০২ জন
প্রথম বিভাগ - ৩৬ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৫৮ জন
তৃতীয় বিভাগ- ৩ জন
স্টার-৮ জন, সর্বোচ্চ-৬৫৮

মাধ্যমিক ২০০৬ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ১৩১ জন
প্রথম বিভাগ - ৩৯ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৬৭ জন
তৃতীয় বিভাগ- ৫ জন
স্টার-১১ জন, সর্বোচ্চ- ৭১১

মাধ্যমিক ২০০৭ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ১১৮ জন
প্রথম বিভাগ - ২৫ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৬৬ জন
তৃতীয় বিভাগ- ১৬ জন

মাধ্যমিক ২০০৮ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ১১৮ জন
প্রথম বিভাগ - ৩৯ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৪৩ জন
তৃতীয় বিভাগ- ১৫ জন

স্টার-১১ জন, সর্বোচ্চ-৭৬৩ স্টার-১৪ জন, সর্বোচ্চ- ৭৫০

উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের ফলাফল

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০১ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ২৫০ জন

প্রথম বিভাগ - ২৬ জন

দ্বিতীয় বিভাগ- ৬৯ জন

সফল (পাশ) - ৮৮ জন

সর্বোচ্চ নম্বর -৮৪৮

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০২ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ২৫০ জন

প্রথম বিভাগ - ২১ জন

দ্বিতীয় বিভাগ- ৮৪ জন

সফল (পাশ) - ৪৯ জন

সর্বোচ্চ নম্বর -৬৭৯

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০৩ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ২৫৯ জন

প্রথম বিভাগ - ৪০ জন

দ্বিতীয় বিভাগ- ৭৬ জন

সফল (পাশ) - ৮৭ জন

সর্বোচ্চ নম্বর -৮২৯

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০৪ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ২১২ জন

প্রথম বিভাগ - ২৪ জন

দ্বিতীয় বিভাগ- ৮৭ জন

সফল (পাশ) - ৪৫ জন

সর্বোচ্চ নম্বর -৭৮৮

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০৫ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ২০২ জন

প্রথম বিভাগ - ২১ জন

দ্বিতীয় বিভাগ- ৮৫ জন

সফল (পাশ) - ৬৪ জন

সর্বোচ্চ নম্বর -৯২০

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০৬ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ১৯৯ জন

প্রথম বিভাগ - ৩৫ জন

দ্বিতীয় বিভাগ- ৭৪ জন

সফল (পাশ) - ৪৮ জন

সর্বোচ্চ নম্বর -৮৫১

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০৭ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ১৮৬ জন

সফল (পাশ) - ১৬৭ জন

উচ্চ মাধ্যমিক ২০০২ — ফলাফল

মোট পরীক্ষার্থী- ২২৪ জন

সফল (পাশ) - ১৯৪ জন

২০০৭ থেকে গ্রেডেশন প্রথা আরম্ভ হয়েছে।
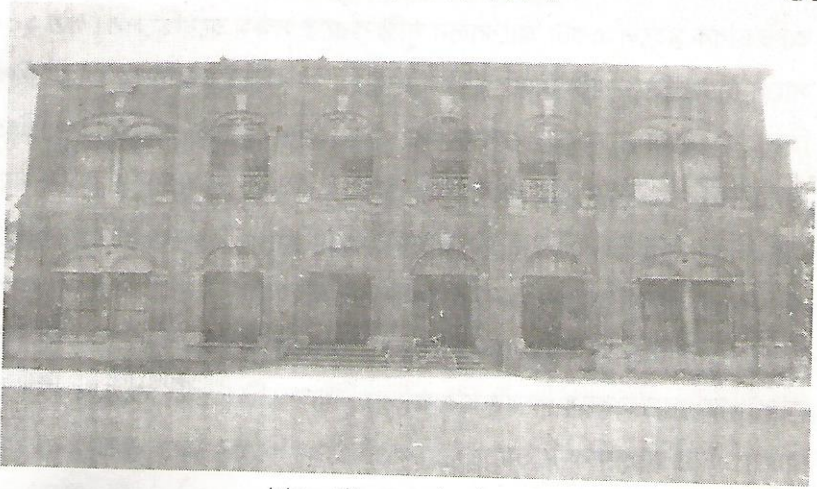
ইউরোপিয়ান গেষ্ট হাইস

১৯৭৬ সাল থেকেই ১০ ক্লাসে মাধ্যমিক এবং ১২ ক্লাসে উচ্চমাধ্যমিক বিভাগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ সাল নাগাদ বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য মহাশয় প্রধান শিক্ষক হয়ে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে ছিলেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক বিভাগে কর্মশিক্ষা বিষয়টি চালু করবার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছয়জন জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। আমাদের গর্ভের বিষয় সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুবাবু আমেরিকায় যান এবং তিনি ফিরে আসার পর সারা পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে কর্মশিক্ষা বিষয়টি কোর্সের অর্ন্তভুক্ত হয়। বিষ্ণুবাবুর আমলে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন খুব ভালোভাবে চলতে থাকে ১৯৮০ সাল নাগাদ চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন রানাঘাট থেকে মাননীয় দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়। তাহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির পঠন পাঠন ছাড়াও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রভূত উন্নতি ঘটে। মাননীয় অখিল কুমার কর্মকার মহাশয় প্রথমে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং ১৯৯৩ সাল থেকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে চেয়ারে বসেন। ২০০০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করলে ২০০১ সালে আড়াইডাঙ্গা থেকে মানবেন্দ্র কুমার মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেন। তার একান্ত চেষ্টায় ২০০৪ সালে মাধ্যমিকে প্রায় ৯৮ শতাংশ ছাত্র পাশ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি চাঁচলে ছাত্রদের

অভিভাবক মহলে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গত ২০০৭ সালে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে আসরারুল হক সাহেব মহাশয় প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং সহযোগিতায় বিদ্যালয়টির পরিচালনার ভার তিনি শক্ত হাতে ধরেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যালয়টির বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১৮৫০ জন। ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়েও বলতে গেলে কালিয়াচক ও মথুরাপুর বিদ্যালয়ের পড়েই সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের অবস্থান রয়েছে এবং এটি মালদা জেলার তৃতীয় মতান্তরে চতুর্থ প্রাচীন বিদ্যালয়। আর মাত্র কয়েক বছর পরেই এই প্রাচীন বিদ্যালয়টির ১২৫ বছর পূর্তি পালিত হবে। উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ছেলে মেয়েরা বিজ্ঞান কলা ও বানিজ্য শাখায় একত্রে লেখা পড়া করে থাকে। বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল ভালো হয় বলে এখনও জেলার মানচিত্রে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের নাম অক্ষুন্ন রয়েছে। সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের বায়োলজির শিক্ষক শ্রী কমল কৃষ্ণ দাস মহাশয় মালদা জেলায় **"আমের উপর"** দীর্ঘ গবেষনার পর উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D.- উপাধী লাভ করেছেন মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর কমল বাবুর যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে। একজন সহকারী শিক্ষক হিসাবে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে কমল বাবুই সর্বপ্রথম এই উপাধী লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিদ্যালয়টির বর্তমান শিক্ষকের সংখ্যা ৩৪ জন, পার্শ্ব শিক্ষকের সংখ্যা ৬ জন, করনিক ২ জন, লাইব্রেরীয়ান ১ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ৫ জন। সম্প্রতি এখানে ভোকেশনাল শিক্ষক হিসেবে ২ জন শিক্ষক যথাক্রমে মোবাইল রিপেয়ারিং এবং আমিন কোর্সে নিযুক্ত হয়েছেন।
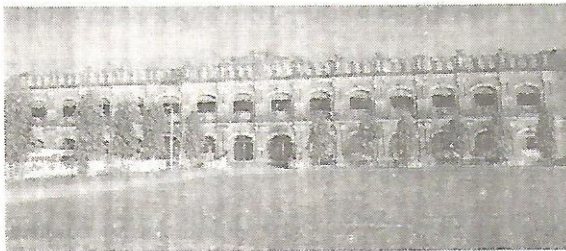
চাঁচল রাজ বাড়ি (১৮৭২-৮২ নির্মান কাল)

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক প্রসঙ্গ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই চাঁচলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই চাঁচলে শিক্ষার হারও প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতি হিসাবে চাঁচল রাণী দাক্ষায়ণী সহ কলিগ্রাম, গোবিন্দপাড়া, শীতলপুর, খরবা, দড়িয়াপুর ইমামপুর প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। চাঁচল প্রপার এলাকায় যেহারে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্ত্তির চাপ দেখা যায় তাতে করে খুব শীঘ্রই আরো দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খুব প্রয়োজন। চাঁচলের দানবীর রাজা শরৎচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন সিদ্ধেশ্বরী ও দাক্ষায়ণী বিদ্যালয় নইলে চাঁচলের শিক্ষার হাল খুব খারাপই ছিল। এক-একটি শ্রেণী কক্ষে ৭০-৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী ঠাসাঠাসি করে বসতে হয় এখানকার বিদ্যালয়গুলিতে ১৫-২০ ভাগ ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে সকলের ভালভাবে বসবার সুবিধা হয় নইলে ঠিক ইউনিক টেস্টের আগে আগে ছাত্র উপস্থিতির হার বেশি থাকে ফলে সেই সময় পেছনের দিকে জায়গা না পাওয়ায় ৫-১০ জন ছাত্রকে দাড়িয়ে থেকে কোন রকমে ক্লাস করতে হয়। জমিদার রাজাবাবুদের কথা বাদ দিলে বর্তমান রাজা, মন্ত্রী, আমলা, নেতা, এম.এল.এ, এম.পি. সকলেই নির্বিকার দর্শক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন, ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন তথা চাঁচলের ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে চাঁচল শহরটি নিজে নিজেই তার কক্ষ পথে পরিবর্তন করতে করতে একদা জঙ্গলাকীর্ণ চঞ্চুর আগাছা যুক্ত মহানন্দার নদী বিধৌত চাঁচল (চাচর) একটি আধুনিক শহরে পরিনত হতে চলেছে।

যা হোক চাঁচল চক্র প্রাথমিক বিভাগের S.I. of School (Pry) অফিসে গিয়ে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক ফকির চাঁদ সাহা ও অফিস কর্মী শ্রীমতি দেবারতী পান্ডের কাছে যে তথ্য জানতে পারলাম তাহা নিম্নরূপ। বর্তমানে চাঁচল ১ নং ব্লকে চাঁচল চক্র এলাকায় রয়েছে ৫৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং খরবা চক্র এলাকায় রয়েছে ৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

চাঁচল ২ এলাকায় অর্থাৎ মালতীপুর ব্লকে মালতীপুর চক্র এলাকায় রয়েছে

ইন্দিরা স্মৃতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র- (১৫ আগষ্ট, ২০০০ জেলেপাড়া - চাঁচল)

মোট ৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুদ চাঁচল টাউনশিপ এলাকায় রয়েছে মাত্র দুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় তার একটির নাম সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬৮ নং সিঙ্গিয়া মৌজায়) এবং অপরটি হল চাঁচল হাড়ী পাড়া জেলেপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭০ নং চাঁচল মৌজায়) এটি জন্মলগ্নে জেলেপাড়ায় স্বর্গীয় খগেন কর্মকারের মাটি কোঠা ঘরে এবং ঁবিনোদ বিহারী দাসের চেয়ার টেবিল ও বেঞ্চের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল বর্তমানে হিন্দু হোষ্টেলের কাছে বামুন পাড়ায় নিজস্ব জায়গায় সরকারী গৃহে (চাঁচল ৭০ নং মৌজায়) অবস্থিত। আর ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ও ছাত্রভর্ত্তির চাপে ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠেছে (১) বিবেকানন্দ শিশু মন্দির (২) সরস্বতী শিশু মন্দির (৩) শিশু তীর্থ বিদ্যাপীঠ (৪) রবীন্দ্র শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং (৫) আদর্শ পল্লীতে একটি মকতব রয়েছে। আর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মিশনের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর দ্বারা পরিচালিত ২টি সরকারী শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এস.এস.কে.) বিগত ২০০০ সালে ১২০ নং গ্রাম সংসদ (চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেল) এলাকার তৎকালীন নির্বাচিত প্রতিনিধি আব্দুস সাত্তার ও মজিবর রহমান এবং লেখকের (মেঘনাদ দাস) নিজস্ব উদ্যোগে খেলন পুর গ্রামের একটি ক্লাবে গড়ে ওঠে খেলনপুর শিশু কেন্দ্র (এস.এস.কে) বর্তমানে এটি আদর্শ পল্লীতে অবস্থিত। অন্যটি লেখকের উদ্যোগে লেখকের পিতার জায়গায় (জেলেপাড়া) চাটাইয়ের ঘরে লেখকের

একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং গৃহনির্মানের যাবতীয় খরচে গড়ে ওঠে ইন্দিরা স্মৃতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ১৫ই আগষ্ট ২০০০ সালে এই বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টি মৌজা ৭০ চাঁচল ৪৮৪ নং দাগে লেখকের দানকৃত ২ কাঠা মাটিতে সরকারী আর্থিক সাহায্যে একটি গৃহ নির্মান করা হয়েছে এবং ঐ জায়গাতেই বিদ্যালয়টি চলছে। এবারে থানার মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর এর কথায় আসা যাক যা হোক এ হল চাঁচলের শিক্ষার বর্তমান হাল হকিকত। এ ছাড়া চাঁচল ১ ও ২ নং ব্লক এলাকায় যে সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তার তালিকা দেওয়া হল ঃ

১) চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন (উচ্চ-মাধ্যমিক)-১৮৮৮
২) চাঁচল রাণী দাক্ষায়নী বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ-মাধ্যমিক)-১৯৪৫
৩) কলিগ্রাম হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক) - ১৯৪৫
৪) কলিগ্রাম বালিকা বিদ্যালয় (মাধ্যমিক)
৫) শীতলপুর মোবারকপুর হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক)
৬) ডি. পি. মল্লিকপাড়া হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক)
৭) খরবা এইচ. এন. এগ্রিল হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক)
৮) ডি. আই. বি. হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক)
৯) বীরস্থলী হাইস্কুল
১০) সাউরগাছি বিদ্যানন্দপুর হাইস্কুল
১১) সদরপুর হাইস্কুল
১২) অনুপনগর কে. এফ. যে. হাইস্কুল
১৩) চড়োলমনি হাইস্কুল
১৪) গঙ্গাদেবী হাইস্কুল
১৫) গোয়ালপাড়া হাইস্কুল
১৬) জালালপুর এইচ. আর. এ. হাইস্কুল
১৭) মালতীপুর রোহিনীকান্ত গার্লস হাই স্কুল
১৮) গোবিন্দপাড়া হাইস্কুল (উচ্চ-মাধ্যমিক)
১৯) যদুপুর হাইস্কুল

২০) জিতারপুর হাইস্কুল

চাঁচল ১ ও ২ নং ব্লকের মাদ্রাসা গুলির তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১) থাহাঘাটি হাই মাদ্রাসা (উচ্চ-মাধ্যমিক)

২) জালালপুর হাই মাদ্রাসা

৩) সন্তোষপুর হাই মাদ্রাসা

৪) বাটনা হাই মাদ্রাসা

৫) নৈকান্দা হাই মাদ্রাসা

৬) চান্দুয়া হাই মাদ্রাসা

৭) নিমগাছি হাই মাদ্রাসা —ইত্যাদি

এছাড়াও রয়েছে নিয়মিত স্কুলে না গিয়ে বাড়ীতে বসেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করবার জন্য রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় এবং স্নাতক ডিগ্রির জন্য নেতাজী মুক্ত বিদ্যালয়। ইদানিং প্রচুর পরিমানে বিবাহিত ও বয়স্ক মহিলা ও পুরুষরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এস.এস.কে., এম.এস.কে., আই.সি.ডি.এস.—এর আশা প্রভৃতি প্রকল্পে বহু মহিলাগন তদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে।

২০০৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারীগরী বিভাগের (Technical Trade) মাধ্যমে চাঁচলের সিদ্ধেশ্বরী, কলিগ্রাম, খরবা, গোবিন্দপাড়া ও চান্দুয়া মাদ্রাসায় বিভিন্ন Trade ছয় মাসের জন্য হাতে কলমে অষ্টম শ্রেণী পাশ ছেলে মেয়েদের জন্য চালু হয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা। এইসব প্রতিষ্ঠানে এসে ছেলে মেয়েরা সহজেই শিখে নিতে পারে রেডিও টিভি, মোবাইল রিপেয়ারিং, টেলারিং শিক্ষা,হেলথ ওয়ার্কার, জমি জরিপ কার্য্যের জন্য আমিন, জ্যাম, জেলি, শশ বিউটি ফিকের্শন কোর্শ ইত্যাদি। এই বৃত্তি মূলক শিক্ষা চালু হওয়ার ফলে গ্রাম গঞ্জের বহু ছেলেমেয়ে হাতে কলমে তাদের জীবিকা অর্জনের কাজ সহ Diploma Certificate নিতে পারছে খুব সহজেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রথম দিকে প্রতিটি ট্রেডে ২০/২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি হলেও ২/৩ মাস পর তাদের উপস্থিতির হার দিন-দিন কমে যাচ্ছে এর কারন অনুধাবন করা আমাদের বিচার্য্য বিষয়।
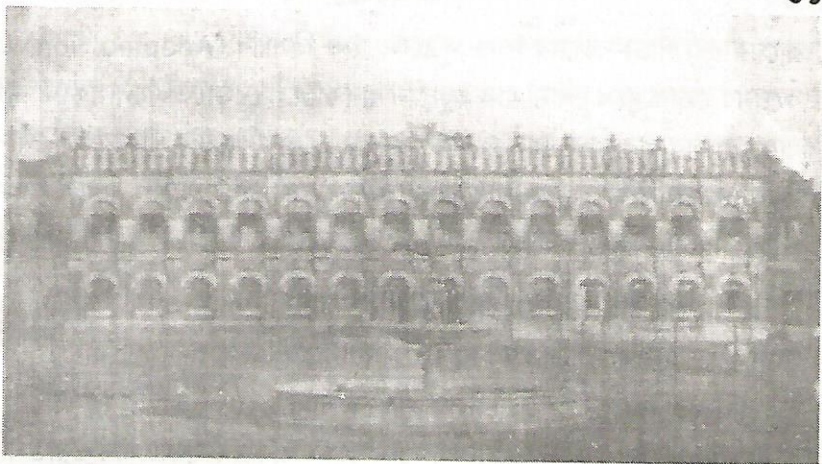
রাজ বাড়ির সামনে জলের ফোয়ারাটি ১৯৬৯ সাল অবধি ছিল (বর্তমানে নেই)

রাজা শরৎচন্দ্র পর্ব

চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল সংলগ্ন এলাকায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী পুরাতন রাজ প্রাসাদেই মহাসমারোহে তাহার বিশাল জমিদারী দেখাশোনা করতেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পর্বে বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক থেকে যা নথি পাওয়া গেছে। তার জোড়ে বলা যায় যে চাঁচল রাজ এষ্টেটের জন্ম ১৮৪৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে করে গেছিলেন। তখন জমিদারীর এলাকা গৌড়হন্ড, হাতিন্ডা, রোকনপুর এবং জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে সামসী, ভাদো, কারবালা এলাকা ভুক্ত কিছুজমি অর্থাৎ শেরশাবাদ পরগনার। কিছুটা এলাকা চাঁচল রাজ এস্টেট ভুক্ত ছিল। ১৮৬৫-৬৬ সাল নাগাদ (আনুমানিক) রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাহার দুই রানী ও দুই কন্যা, জামাতা ও নাতিদের রেখে পরলোকা গমন করেন। তিনি অ-পুত্রক ছিলেন বলে বড় রানী সিদ্বেশ্বরী দত্তন নিতে না পারলে ছোট রানী ভূতেশ্বর আইনগত ভাবে দত্তক নিতে পারবেন। তিনি এ ব্যবস্থা করে গিয়ে ছিলেন কিন্তু বড় রানী সিদ্বেশ্বরী দেবী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী এবং সংসারের ও জমিদারীর উপর আর কর্তৃত্ব ছিল খুব বেশি। যাহোক রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অবর্তমানে বড় রানী সিদ্বেশ্বরী দেবী মালদা কোর্টে দত্তক গ্রহণের জন্য আবেদন করেন এবং এই আবেদন মূলে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে (আইনসভায়) এটি অনুমোদন পায়। আইনগত অসুবিধা শেষ হলে বড় রানী মুর্শিদাবাদের নীমতিতা গ্রামের এক সৎ ব্রাহ্মণ শ্রী মধুসূদন

রায়ের ৫ (পাঁচ) বছরের শিশু পুত্রকে দত্তক হিসাবে (Adopted Son) গ্রহণ করেন। লোক মুখে শোনা যায় মধুসূদন বাবু চাঁচলে বেড়াতে এলে সকলে রাজার বাবা, রাজার বাবা কথা বলে কটাক্ষ করতেন। বেশ কিছু দিন থাকার পর গোপনে মধূসুদন বাবুকে নাকি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন। এই ভাবেই নাবালক রাজার পিতৃ পরিচয় বিলুপ্ত করা হয়।

এখান থেকেই শুরু হল জমিদারীর নতুন পর্ব। তখন ও দেশ স্বাধীন হয় নি সারা দেশে চলছে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদ। বড় রানী সিদ্বেশ্বরী খুব বুদ্ধিবতী ছিলেন বলে নাবালক পুত্রকে সামনে রেখে তাহার জমিদারীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মালদা কোর্টে আবেদন করেন একজন 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' এর জন্য। ১৮৭০ সালের নভেম্বর মাসে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ইংরাজ মি.এইচ.আর র‍্যালি (Mr. H.R. Raily) নামে ব্যক্তিটিকে চাঁচল রাজ এষ্টেটের নাবালকের সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সরকারীভাবে নিয়োগ করেন। ১৮৭৩ সালের বোর্ড অব রেভিনিউ বিভাগের অফিসার বাবু সীতাকান্ত মুখার্জীর এক রিপোর্টে জানা যায় যে এই সময় সারা জেলায় খাজনা বা রাজস্ব হিসাবে চার প্রকার জমি রাজস্ব বা জমিদারের নাম উল্লেখ্য পাওয়া যায়।

Mr.H.R. Raily, Manager under the court of wards of the Chanchal Raj Estates. The tenures are devided in to four (4) classes, - 1) The Estates paying rent direct to government, 2) intermediate tenures, 3) cultivating and miscellaneous tenures 4) Rent free tenures. (Statistical Account of Bengal (Malda) by W.W. Hunter (1876) page - 78-82).

এই সময় সমগ্র চাষযোগ্য আবাদী জমি গুলিকে দুই ভাগে চাষবাস করা হত যেমন — ১) খামার প্রথার মাধ্যমে প্রায় ১৩০-১৭০ একর জমি ছিল এবং (২) নিজ জোত বা নিজ তালুক ৪০ থেকে ৩০০ বিঘা পরিমান জমি নিয়ে গঠিত হত। হাতিন্ডা এলাকার ২৯১২ একর জমি সার্ভিস ল্যান্ড হিসাবে ব্যবহৃত হত। চাঁচল রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার হিসাবে তার সুযোগ্য ও দক্ষ পরিচালনায় জেলার জমিদারীর ইতিহাসে চাঁচল রাজ এষ্টেটের নাম জেলার জমিদারীর মানচিত্রে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে থাকে। মালদা জেলা গেজেটিয়ার G.E. Lambourn

সূত্রে জানা যায় যে বেরিলির সৈয়দ আহমেদের ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাব গত শতকের মাঝামাঝিতে চাঁচল এলাকায় পড়ে এবং রানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর অভিযোগে বেশ কিছু ব্যক্তিকে ১৮৬৯ সালে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রজা নিপীড়ন এবং প্রজা অসন্তোষের কথা শোনা যায়। সেই জন্যই লেখক শিবরাম চক্রবর্তী লিখিত 'জমিদারের রথ' বইটি রাজরোষে পড়ে এবং বই বিক্রি ও ছাপানো উভয়ই বন্ধ (Band) করা হয়। এই আন্দোলনের ফল শ্রুতিতে শিবরাম বাবু ১৯২১ সালে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়েই মনের দুঃখে কলকাতায় চলে যান।

বড়রানী সিদ্বেশ্বরী ও স্টেটের ম্যাজেজারের দক্ষ পরিচালনায় চাঁচলের বাইরে থেকে শিক্ষিত ও দক্ষ লোকজন ও কর্মচারীকে আনিয়ে জমিদারী চালাতেন। সিদ্বেশ্বরী দেবীর ডাকে তার দুই বোনের বংশধরগণকে হুগলী ও কোলকাতা থেকে এনে চাঁচলের বামুন পাড়ায় স্থানীয় ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে ছিলেন। আগেও বলেছি একজন L.M.E. ডাক্তারের পরিবারকে সাবেক তোষাখানার (পুরাতন রাজবাটি) পাশে বামুন পাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ডাক্তার বাবুর পুত্র পৌত্রাদি বর্তমানে বামুন পাড়াতে নেই। এই সময় গড়ে প্রতিটি প্রজার ২ একর বা ৬ বিঘা জমি ছিল। প্রতি একরে জমির খাজনা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১) স্থায়ী রায়তদের ২ টাকা ১ আনা ১ পাই/প্রতি বছর।

২) দখলী রায়তদের ২ টাকা ১১ আনা ১ পাই/প্রতি বছর।

৩) রায়তের জমি - ৯টাকা ৩ আনা ৫ পাই/প্রতি বছর।

এছাড়া পুকুর খোরা, পাকা বাড়ির সেলামী, জমি হস্তান্তর মাশুল জেলায় সবচেয়ে কর্ম অর্থাৎ প্রতি টাকায় ২ আনা, তহুরী প্রতি টাকায় ১ আনা নেওয়া হত। প্রজা ও চাষীদের জমির সীমানা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যেন কোন রূপ ঝগড়া ঝাটি না হয় তার জন্য ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু অর্থাৎ র‍্যালী সাহেব সমস্ত প্রজার জমি জরিপ কার্য সম্পন্ন করেন ১৮৭৮ সালে। (পরবর্তীতে রাজা শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুর ও ১৯০৪ সালে পুনরায় জরিপকার্য সম্পন্ন করেন।) প্রথমবার জমির আদর্শ মান ছিল ১০০ বা ৯০ হাত পরে তাহা কমিয়ে আদর্শ মাপ করা হয় ৮০ X ৮০ বর্গ হাত এবং খাজনা প্রতি টাকায় আট আনা বাড়ানো হয়।

যা হোক বড়রানী সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও ম্যানেজার বাবুর (র‍্যালী সাহেব) সুদক্ষ পরিচালনায় বালক শরৎচন্দ্র লেখাপড়া শিখতে থাকে এবং বড় হতে থাকে পুরাতন রাজ প্রাসাদে (হিন্দু হোষ্টেল এলাকায়)। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার স্মৃতি রক্ষার্থে রায় পাড়ায় শিব মন্দিরের উত্তরে যে হাসপাতালটি গড়ে ওঠে সেই লাল রংয়ের বাড়িটি (বর্তমানে আউটডোর সেকসেন) সেই গৃহেই প্রজাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল গৃহটি নির্মান করা হয় ১৮৭৩-৭৫ সাল নাগাদ। এই লাল বাড়িটির পেছনের বারান্দায় ছিল আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সু-সজ্জিত কাঁচে মোড়া গোল বারান্দাটি অপারেশন থিয়েটার। এই হাসপাতালে ছিলেন একজন এম.বি. ডাক্তার ও একজন কম্পাউন্ডার। ঐ বড় ডাক্তারের অধীনে ছিলেন একজন L.M.E ডাক্তার ও আরো একজন কম্পাউন্ডার। এই ডাক্তার বাবুদের থাকার জন্য তৈরী করা হয়েছিল কোয়াটার সেগুলি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বেশি অসুস্থ রোগীদের জন্য ১২টি শয্যার ব্যবস্থা ছিল এই হাসপাতালে থাকলেও এটি ছিল প্রাইভেট মালিকানায় (চাঁচল দ্বারা পরিচালিত) জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল। সুদুর লন্ডন থেকে আগত আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এই অপারেশন থিয়েটার ঘরটি। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ইংরেজ কর্মচারী তার জেলা গেজেটিয়ারে বলেছেন — It is one of the best equipped dispensaries in the District. The private dispensry at Chanchal, which is maintained by Raja Sarat Chandra Roy, is in charge of an assistant sergeon, and medical assistance is afforded to out lying parts of the raja's estate by itenerant Hospital assistants." — (Gazzateer of Malda District - G E. Lambourn - 1810) Public Health Chapter page - 43

এই সময় খরবা অঞ্চল এলাকায় মহামারীর প্রকোপে বহু লোক মারা যায়। এর প্রধান কারণ ছিল পানীয় জল, খাওয়া-দাওয়ার, গন্ডগোল, গ্রাম্য এলাকায় আজকের মত কোন সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা ছিল না। হিন্দুরা শ্মশানে মৃত মানুষদের ভালোভাবে পোড়াতেন না। পায়খানা ছিল না বলে একই পুকুরে গরু মহিষ স্নান, মানুষের স্নান, কাপড় কাচা ও পায়খানা করে জল ব্যবহার করতেন তাইতো লেসবোর্ন বলেছেন - "The disease is Largely spreed by the practice of throning of half burnt body (bodies) into the river."

বিগত ১৯৭২-৭৭ সালের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় এর আমলে হাসপাতালটি অধিগ্রহণ করেন এবং তিনি এসে ৮০টি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটির নতুন ভবনটি উদ্বোধন করেন। পরবর্তী কালে এখানে শর্যা বাড়িয়ে ১১০টি করা হয়। চাঁচল রাজ এষ্টেট থেকেই এই হাসপাতালের যাবতীয় খরচ খরচা দেওয়া হত। ১৯৫৩ সালে যখন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয় তখন এই হাসপাতালটি ৯৪ শতক (প্রায় ১ একর) জমির উপর বিদ্যমান ছিল। চাঁচল এষ্টেটের পক্ষে অফিসিয়াল ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খতিয়ান নং ১০৮৪/১ মৌজা - সিঙ্গিয়া - ৬৮, দাগ নং - ১০৭৬ মোট জমি ৯৪ শতক। দালান চারটি সহ ছিল ঈশ্বরচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়টি অবস্থিত। হাসপাতালটি বর্তমানে ৮০ শয্যা থেকে বাড়িয়ে ১১০ শয্যা বিশিষ্ট করা হয়েছে। বিগত ১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করবার পর গ্রামীন হাসপাতালে রূপদান করা হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে গরীব রোগীরা এসে অসহায় হয়ে মালদা সদর হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়। বর্তমানে ছয় (৬) ডাক্তার ও দুই জন লেডি ডাক্তার সেবিকা ও স্বাস্থ্য কর্মী থাকলেও নেই রক্ত সংরক্ষণ আধার (Blood Bank), অক্সিজেন, E.C.G, X-ray তে ছুবি হলেও নেই Report এর জন্য রেডিওলজিস্ট। শুনেছি চাঁচল গ্রামীণ হাসপাতালে গর্ভবর্তী মায়েদের জন্য কিছু কিছু সিজার কেশ (রক্তের ব্যবস্থা বলে) হচ্ছে কিন্তু Blood Bank নেই বলে বিপদ গ্রস্থ গর্ভবর্তী মায়েদের চলে যেতে হচ্ছে ৭০ কিমি দুরে সদর হাসপাতালে এবং বিলাসবহুল নার্সিং হোমে। ১৯শে জুন, ২০০৮ আনন্দ বাজার পত্রিকায় দেখলাম আজ থেকে প্রায় ছয় (৬) বছর আগে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া টাকায় তৈরী হয়েছে একটি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার। কিন্তু Blood Bank -এর লাইসেন্স না থাকার জন্য রক্ত সঞ্চয় করে রাখার মতো কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্য গ্রাম থেকে আসা দুঃস্থ প্রসুতি মায়েদের অসহায় হয়ে চলে যেতে হচ্ছে জেলা শহরে। কিন্তু আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে এক সময় এটি ছিল চাঁচল রাজা বাবুর দানে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ১০০ বছর আগের মালদা জেলা গেজেটিয়ারে G.E. Lambourn (I.C.S. officer) Public Health chapter Page 42 - 43 বলেছেন In 1871 there was only one dispen

sary in the District, that at English Bazar, which ws started in 1861. At the present time there are ten, all which, with the exception of that at 'CHANCHAL' receive subridees from the District Board and, in additionl ,those of English Bazar adn old Malda and Malda and Nawabgang from the Municipalties in which are situated. The private dispensary at Chanchal, which is maintained by Raja Sarat Chandra Roy, is an charge of an assistant Surgeon, and medical assistance is afforded to out lying parts of the Raja's Estate by itinerant hospital assistants. It is one of the best equipped dispersaries of the District.

ষ্টেটের ম্যানেজার র‍্যালী সাহেবের সময়ে বড় রানী মার (সিদ্বেশ্বরী) সহযোগিতায় চাঁচল থেকে সামসি পর্যন্ত রাস্তায় দুই ধারে সারি সারি তরল গাছ লাগিয়ে ছিলেন। বর্তমানে সিদ্বেশ্বরী স্কুলে একটি গাছ এবং চাঁচল তরলতলার বর্তমান তরল গাছটি তার সাক্ষ্য বহন করছে। র‍্যালি সাহেব চেয়েছিলেন সামসি পর্যন্ত গাছগুলি লাগাতে কিন্তু মালতীপুর পর্যন্ত গাছগুলি লাগানোর পর নাবালক শরৎচন্দ্রের বয়স ১৬ বছর পূর্ন হলে রানী মা ম্যানেজার র‍্যালী সাহেবকে চাঁচল ছেড়ে চলে যেতে বলেন। এক রকম অপমানের গ্লানি মাথায় নিয়েই র‍্যালি সাহেব মনের দুঃখে চাঁচলের বহু জনহিতকর কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যায়। এখানেই শেষ হলে Court of wards এর কার্যকাল বালক শরৎচন্দ্র ১৬ বছর বয়সে রাজ মুকুট পরে চাঁচল এষ্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। হিন্দু হোষ্টেল লাগোয়া পুরাতন রাজপ্রাসাদ থেকেই জমিদারী পরিচালনা করতে থাকেন। পুরাতন রাজ বাটিটি ছিল বেশ প্রাচীন এবং বেশ কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই সময় এক ভূমিকম্পে পুরাতন রাজবাটির অনেকটা অংশ ফাটল দেখা দেয়। চাঁচল রাজ এষ্টেটটি ছিল বিশাল বড় গৌড়হন্ড, হাতিন্ডা ও রোকন পরগনায় বিশাল পরিমান জায়গা জমি নিয়ে বিস্তৃত ছিল চাঁচল রাজ এষ্টেটের সীমানা। জমিদারীর আয় ওদিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ইংরেজ সরকার বাহাদুর এর কাছে রাজাবাবু ক্রমশ সুনাম অর্জন করতে থাকেন। বিগত ১৮৭২-৮২ সাল মধ্যে মহানন্দা নদীর পূর্ব পাড়ে অর্থাৎ সিঙ্গিয়া-৬৮ মৌজায় স্যার জন স্টুয়ার্ট লয়েড কোম্পানীর মুখ্য স্থপতির নকসা অনুযায়ী এবং স্টুয়ার্ট লয়েডের তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত নবাব প্যালেসের অনুকরণে নতুন বর্তমান রাজবাড়িটির নির্মান কার্য সম্পন্ন হয়।

এটির নির্মান শৈলী অত্যন্ত সুন্দর এবং খুব শক্ত। ইটের গুড়ো চুন, খয়েরের জল ও চুন দিয়ে তৈরী একপ্রকার বিশেষ আঠা তৈরী করে ইটগুলিকে সারি সারি সাজিয়ে এই দোতালা বাড়িটি তৈরী করা হয়েছিল। রাজ বাড়ী লাগোয়া উত্তর দিকে রামসীতার মন্দির। মন্দির টির কারুকার্য ও নির্মান শৈলী মালদা জেলায় এক প্রাচীন শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। এই ঠাকুর বাড়ীর ভেতরে একটি ঘরে রামসীতার, একটি ঘরে সিংহবাহিনী, এবং রাধা কৃষ্ণ ঠাকুরের বিগ্রহ দেখা যায়। রামসীতা রাজ বাড়ীর ঠাকুর এবং সিংহবাহিনী হল রাজ পরিবারের কুলদেবতা। রাম সীতা ও রাধাকৃষ্ণের ছোট সোনার মূর্তি ও ছিল এখন সেটা দেখা যায় না। মন্দিরের গায়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায়।
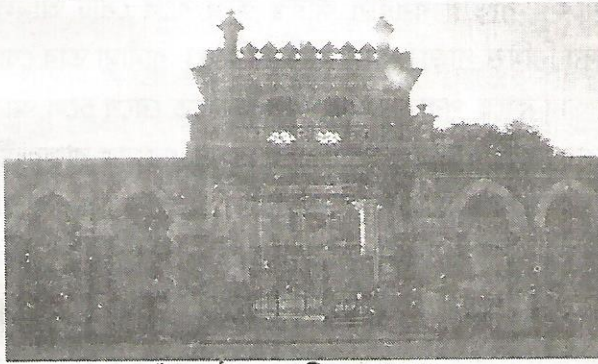
চাঁচল ঠাকুর বাড়ির মুখ্য দ্বার

রাজাবাবু থাকাকালীন প্রতিদিন ঠাকুর বাড়ীতে শোনা যায় ১ মন চালের ভোগ রান্না হত। সিদ্বেশ্বরী স্কুলের ২০০-২৫০ জন ছাত্র প্রতিদিন টিফিনের সময় ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে পেট ভরে প্রসাদ খেয়ে আসতো। দুঃখের বিষয় আজ সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। সামনের মুখ্য দরজার সামনে মাঠের মাঝখানে অর্থাৎ রাস্তার মাঝখানে গোলাকার একটি জলের ফোয়ারা ছিল। ১৯৭০-৭৫ সালেও সেটি ছিল এখন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ইউরোপিয়ান সাহেবদের জন্য তৈরী হয়েছিল গেষ্ট হাউস বর্তমানে সিদ্বেশ্বরী বিদ্যালয়ের H.S. Section -এর দোতালা বাড়িটি হল ইউরোপিয়ান গেষ্ট হাউস। এই ঘরের পাশের একতালা হল ঘরটি পুরাতন খুব মজবুত টালির বারান্দা সহ ঘরটি হল রাজ বাড়ীর রেকর্ড রুম। বর্তমানে সেকেন্ডারী বিভাগের অপিস ঘরটি অর্থাৎ টালির বারান্দা যুক্ত বর্তমান অফিস ঘরটি ছিল কাচারী বাড়ী এবং উল্টোদিকের অর্থাৎ ইউরোপিয়ান

গেষ্ট হাউসের আদলে তৈরী যে দোতালা ঘর তৈরী হয়েছিল মহাফেজ খানাটি। ইংরাজ সাহেবরা এলে রাজবাড়ির সব হাতি গুলিকে সু-সজ্জিত করে Gourd of honour দেওয়া হত এবং সামসী রেল স্টেশন থেকে হাতীর পিঠে ও সু-সজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে সাহেবদের চাঁচল রাজ দরবারে আনা হত। চারিদিকে উড্ডীন থাকতো ব্রিটিশ পতাকা। বিলাতী মদ এবং কাটিহারের সোরাবজীর রাধুনিরা এসে ইউরোপিয়ান সাহেবদের রান্না করতেন। বিশাল এলাকা জুড়ে নতুন রাজ বাড়ী তৈরী হলে রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর ১৯০৪ সালে নতুন রাজ বাড়িতে গৃহ প্রবেশ করেন। রাজবাড়ীর কর্মচারী, পেয়াদা, আমলারা দক্ষিণ দিকের পাড়ায় বসবাস আরম্ভ করে বলে সেটি আমলাপাড়া (অর্থাৎ আমলাদের নিমিত্ত পাড়া) নামে খ্যাত হয়েছে। রানীমা তার বোনের ছেলেদের বামুন পাড়ার কাছে পুরাতন ভাঙ্গা রাজবাড়ীতে রেখে চলে আসেন। তাইতো লেখক শিবরাম বার বার দুঃখ করে বলেছেন একমাত্র রাজবাড়ীর মাসোহারাই ছিল তাদের সংসারের বেচে থাকার সম্বল। রসরাজ রসসাহিত্যিক তখন বালক মাত্র তার করুন জীবন কাহিনী শিবরাম নামক পর্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে বলে এখন মূল পর্বে ফিরে আসছি।

বড়রানী সিদ্বেশ্বরী দেবীর জীবিত কালেই কোলকাতার দর্জিপাড়ার এক অপরুপা সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত অর্থাৎ দাক্ষায়নীর সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন রাজা শরৎচন্দ্রের। বাংলা ১৩১০ সালে রানীমা বা সিদ্বেশ্বরী দেবী পরলোক গমন করলে রাজা শরৎচন্দ্র কলিগ্রামের গোস্বামী পন্ডিতদের সু পরামর্শে কাশী ও বেনারস থেকে প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের চাঁচলে এনে বিখ্যাত "দান সাগর" যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। (তথ্য সূত্র - কলিগ্রামের পরিচয় শ্রী কৃষ্ণ বিনোদ গোস্বামী) লোক সুখে শোনা যায় সাতদিন ধরে চাঁচলে এই মহাযজ্ঞের নিমিত্ত ভোজ খাওয়া দাওয়া চলেছিল এবং হাজার হাজার গরীব দুঃস্থ মানুষকে কাপড় পোশাক আদি বিতরণ করা হয়েছিল। ইতি মধ্যেই কুমার শিবপদ-র অর্থাৎ দাক্ষায়নীর পুত্র সন্তান হয়েছে। কুমার শিবপদ এর বয়স পাঁচ বছরে পড়লে কলিকাতায় রেখে লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়।

ইতিহাসে সূর্যাস্ত আইনের কথা আমরা সবাই জানি নির্দিষ্ট দিকে খাজনা না

দেওয়ার জন্য লস্করপুর পরগনাটি পরের দিন নীলামে ওঠে। রাজা শরৎচন্দ্র এই পরগনাটি নগর ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকার বিনিময়ে রানী দাক্ষায়নীর নামে খরিদ করেন। এই পরগনার অধীন ৮৩১ একর বা ১.২৯ বর্গ মাইল জমি ছিল। তার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমির পরিমান ছিল ৬৮৫ একর। যা হোক অকূলে যা দাড়ালো গৌড়হন্ড, হাতিন্ডা, রোকনপুর ও লস্করপুরকে নিয়ে মালদা জেলার একটা বিশাল পরিমান এলাকা খরবা, রতুয়া, তুলসীহাটা থানা অঞ্চলসহ পরানপুর থানা অঞ্চল, এবং গাজোলের কিছুটা এলাকা নিয়ে চাঁচল রাজ এষ্টেট মালদা জেলায় জমিদারীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। এইসব এলাকার প্রজাদের রোগ নিরাময়ের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয় ছাড়াও প্রজাদের জন্য খরবা, গোয়ালপাড়া, মালতীপুর, কোকলামারী, খরবা থানা এলাকায় ও রতুয়া থানা এলাকায় আরো ৫টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেন। ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড গঠন হলে এই সব এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রাজা শরৎচন্দ্র বহু প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা করেন। চাঁচল সিদ্বেশ্বরীসহ এই সকল দাতব্য চিকিৎসালয়ের যাবতীয় খরচ-খরচা চাঁচল রাজ এষ্টেট ফান্ড থেকে নিয়মিত ভাবে দেওয়া হত। আমার পরম শ্রদ্ধেয় ঠাকুরদা স্বর্গীয় গজানন মহালদার (দাস) রাজা ঈশ্চরচন্দ্রের আমলে পুরাতন রাজবাটির সাথে তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। খরবা এলাকার প্রায় ১০০টি পুকুর দেখাশোনার দায়িত্বে তিনি দীর্ঘ দিন জড়িত ছিলেন। কারণ তিনি এক জন মৎস্যজীবি ছিলেন। সেই সূত্রে বর্তমান গোবরজন্নায় দাদুর ১২ বিঘা ভুট্টার জমি ছিল। গোবর জন্নায় কার্ত্তিক পোদ্দার মহাশয় ঠাকুরদার বন্ধু লোক ছিলেন। পরবর্তী কালে ঐ জমি গুলি ˝কার্ত্তিক পোদ্দার মহাশয়ের নিকট বিক্রি করে আসেন। দাদুর কথা চাঁচলের দুর্গাবাড়ী মোড়ের নিকটে গজানন শিবালয় নামক পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখন মূল পর্বে ফিরে আসছি। ইউরোপিয়ান সাহেবদের সাথে একজন জমিদার হিসাবে চাঁচলের রাজাবাবুর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। এক সরকারী রিপোর্টের কথা গুলি এইরূপ বলেছেন।

"The tenants in the Chanchal Estates also enjoy advantages which are not found in other estates. The Raja Bahadur is a very public spirited. Zamindar who has contributed very handsomely to various projects of Public utility." – Final Report on the survey and setlement operation in the Dist. of Malda 1928-35 by M.O. curter (I.C.S.)

এই প্রজামঙ্গলকামী রাজা এলকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন জনহিতকর কার্যের জন্য ইংরেজ সরকার ১৯১১ (মতান্তরে ১৯১২) খ্রিস্টাব্দে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। আগে আলোচিত হয়েছে রাজাবাবু একবার ১৮৭৮ এবং পুনরায় রাজা শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুর চাঁচল এস্টেটের অধীনে সমস্ত জমি ১৯০৪ সালে জরিপ করিয়ে ছিলেন। জি. ঈ. লেমবোর্ন সূত্রে জানা যায় ১৮৮৮ সালে চাঁচল জমিদারীর অন্তর্গত তিনটি গ্রামে যথা - মালতীপুর, সমঝিয়া ও নবগ্রামে একটি আর্থিক সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যায় যে কৃষি শ্রমিকদের মজুরী ছিল পুরুষদের দৈনিক ২ আনা (১৬ আনা বা ৬৪ পয়সায় এক টাকা ধরা হত) এবং বালকদের ছিল ১ আনা তার সাথে খাওয়ার জন্য দেওয়া হত ৯ পাই ও ৬ পাই। ফসল কাটার মজুরী ছিল এক ষষ্ঠাংশ ১/৬ ভাগ। বর্তমানে ও ফসল কাটার মজুরী ১/৬ ভাগ আছে। প্রায় কুড়ি বছর পরে এক সমীক্ষায় জানা যায় যে শ্রমিকেদের মজুরী ও আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দানবীর রাজা শরৎচন্দ্রের জনহিতকর কার্য ঃ

১) তিনি চাঁচল, সামসী, গোহিলা, শ্রীশচন্দ্রপুর, কোকলামারীতে প্রজাদের চিকিৎসার জন্য ৫টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

২) ১৯০৬ সালে বাংলায় মহামারী ও দুর্ভিক্ষ হলে তিনি রেঙ্গন থেকে জলজাহাজে করে এক লক্ষ ষাট হাজার মেট্রিক টন চাল এনে তার জমিদারী এলাকায় গরীবদের মধ্যে বিতরন করেন।

৩) চাঁচল থেকে খরবার আশাপুর পর্যন্ত প্রায় কুড়ি কিমি পথ পাকা রাস্তায় পরিণত করেন।

৪) রাজা শরৎচন্দ্র কোলকাতার মূক ও বধিরদের জন্য একটি স্কুলে এক লক্ষ টাকা দান করেন।

৫) তিনি মালদা শহরে পানীয় জলের পাইপ লাইনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির হাতে এক লক্ষ টাকা তুলে দেন।

৬) সারা বাংলায় জাতীয় শিক্ষা মিশন ব্যবস্থা চালু হলে মালদায় বিভিন্ন স্কুলের বিদ্যালয় গৃহ নির্মান ও জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা শিক্ষাবিদ শ্রী বিনয় কুমার সরকারের হাতে তিন লক্ষ টাকা তুলে দেন।

৭) ১৮৭৫ সালের ভয়াবহ মহামারীতে সুদূর কোলকাতা থেকে কয়েক জন ডাক্তার এবং বহু টাকার ঔষধ এলে এলাকার বহু মানুষের প্রাণহানির হাত থেকে রক্ষা করেন।

৮) ইংরেজ বাজার লাইব্রেরীতে এককালীন ৫০০ টাকা দান করে ১৯৩৭ সাল থেকে আজীবন সদস্য পদ লাভ করেন।

৯) কার্শিয়াং শহরে ২টি শয্যার জন্য টি.বি. রোগীদের নিমিত্ত যাবতীয় খরচ প্রদান করেন।

১০) মালদা শহরে ও টি.বি. হাসপাতালে বহু টাকা দান করেন শরৎ চন্দ্র রায় বাহাদুর।

একথা অনস্বীকার্য যে চাঁচলের জমিদারী সময়ে অর্থাৎ রাজা শরৎচন্দ্রের সময়ে জেলার অন্যান্য জমিদারীর চেয়ে অনেক সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। চাঁচলের বাইরে থেকে নায়েব, গোমস্তা বা পাইকদের এনে রাজাবাবু তার জমিদারীর কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন।

কলিগ্রামের কৃষ্ণ পন্ডিতের খড়ের বিদ্যালয় গৃহ পুড়িয়া গেলে রাজা শরৎচন্দ্র চাঁচল থেকে ১ লক্ষ পাকা ইঁট দিয়া ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে নতুন পাকা ঘর তৈরী করে দেন। ১৯০৪ সালে রাজা বাবু নতুন বাড়ীতে চলেযান তাঁর মাসির ছেলেদের অর্থাৎ শিবরাম চক্রবর্তীর পরিবারকে সামান্য মাসেহারা দিতেন। এক কালীন ২৫,০০০ টাকা দিবেন বলে পরবর্তী কালে লেখক শিবরাম কলকাতা হাইকোর্টে রাজার বিরুদ্ধে কেশ করে হেরে যান। এই পুরাতন রাজ বাড়ীর একাংশে চালু হয় হিন্দু ছাত্রাবাস এবং পরবর্তীকালে খেলন পুর ও ধুনিয়াপট্টির মাঝামাঝি জায়গায় তৈরী হয় মুসলমান ছাত্রাবাস।

কুমার শিবপদ কলিকাতায় থেকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। রাজাবাবু একদিন ১৪ বছরের কুমার শিবপদকে সঙ্গে নিয়ে রানীমা অর্থাৎ দাক্ষায়নী দেবীর সাথে কালীঘাট মন্দিরে পূজা দিতে গেছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ পথে এক ব্রাহ্মণ পূজার ফুল বিক্রি করছিল পেছনে তাহার ১২ বছর বয়সের খুব সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে রাজাবাবুর পছন্দ হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ রাজাবাবু ঐ মেয়েটিকে বাবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ষ্টেটের ম্যানেজার কমলা বাগচীর সাথে

আলোচনা করে কুমারের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিয়ে সম্পন্ন হলে পুত্রবধূ মুক্তকেশী দেবীকে বাবার নিকট রাখতে বলেন এবং ছেলেকে হোস্টেলে রেখে লেখাপড়া করতে বলেন। কুমার শিবপদ ও মুক্তকেশী দেবী গোপনে ভিক্টোরিয়া প্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে মিলিত হত এবং কোন কোন দিন তাহারা একসাথে কালীঘাট মন্দির ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেও বেড়াতে যেত। এই খবর পেয়ে রাজাবাবু খুব রেগে গিয়ে কুমারকে খুব মারধোর করেন। লোক মুখে শোনা যায় এই সময় রাজাবাবুর পারিবারিক অশান্তির জন্য রাণীমা বাবার বাড়ি দর্জিপাড়ায় গিয়ে থাকতেন। কুমারকে রানীমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে দিতেন না। আবার কখনও অপর ভ্রাতার কাছে ভবানীপুরে গিয়ে রানীমা থাকতেন। কুমারের বয়স ২১ বছরে হয়েছে ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা তাহারও একটু একটু হয়েছে। কুমার বাবু তাহার মাতা দাক্ষায়নী দেবী ও মুক্তাকেশীর সঙ্গে সমানে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। বিভিন্ন লোক মুখে শোনা যায় রাজা শরৎচন্দ্র ১৯২৫ সাল নাগাদ একদিন কুমার শিবপদকে হ্যারিংটন স্ট্রিটের বাড়ীতে এনে অতবড় ছেলেকে খুব গালাগালি ও প্রচন্ড মারধোর করেন। মনের দুঃখে কুমার শিবপদ বাথরুমে গিয়ে গ্যাসের পাইপ খুলে আত্মহত্যা করে। কিন্তু কুমার সত্যসত্যই আত্মহত্যা করেছে না তাহাকে মেরে ফেলা হয়েছে এ ঘটনার সত্য মিথ্যা আজও উদ্‌ঘাটন হয় নি। সেই বাড়ীতে কয়েক জন কর্মচারী ছাড়া আর কেহ ছিল না। কমলা বাবু পরের দিন সকালে কুমারকে পড়াতে এসে সিড়ি বেয়ে দোতালায় গিয়ে খোজা খুজির পর কুমারকে মৃত অবস্থায় বাথরুমে পাওয়া যায়। (তথ্য সূত্র চাঁচলের শরংচন্দ্র লেখক ভুবনচন্দ্র দাস) বইটি থেকে জানা যায় রাজাবাবু ছেলেকে দেখে প্রায় পাগল হয়ে গেছিলেন। একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগার করে কেওরাতলা শ্মশানে মৃত দেহ নিয়ে গেলে শ্মশান কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ আটক করেন। তখন কমলাবাবু ষ্টেটের ম্যানেজার যতীশ মজুমদারের দাদা তদানীন্তন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সতীশ মজুমদারকে সব কথা বললে তিনি তার উপরওয়ালা টোগাট সাহেবের কাছ থেকে মৃত দেহ সৎকারের আদেশ নামা এনে দিলে কুমার শিবপদ-র সৎকার্য সম্পন্ন হয়। এখানেই রাজার এক মাত্র পুত্রের মৃত্যুতে চাঁচল রাজ পরিবারের শেষ বংশধর চিরতরে শেষ হয়ে যায়। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে রাজা শরৎচন্দ্র প্রায় পাগল হয়ে যান। চাঁচল ষ্টেটের ম্যানেজার যতীশ চন্দ্র মজুমদারকে সরিয়ে

কমলা বাগচী মহাশয় ষ্টেটের নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। ১৯২৫ সালে কুমার শিবপদ-র মৃত্যু হলে রাণী দাক্ষায়নীর তিনকন্যা ও তিন জামাতা যথাক্রমে প্রথমা কন্যা সুভাষিনী, স্বামী - রাস বিহারী ব্যানার্জী, দ্বিতীয়া কন্যা ক্ষিরোদ বাসিনী স্বামী - মহেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ও তার পুত্র শঙ্কর প্রসাদ মুখার্জী এবং তৃতীয় কন্যা মৃণালিনী স্বামী শিশির কুমার মুখার্জী এসে চাঁচলের রাজ প্রাসাদে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। রাসবিহারীবাবু ও শঙ্কর প্রসাদ মুখার্জী রাজ ষ্টেটের অর্থে সব সময় মদে মত্ত হয়ে থাকতেন আর শিশির বাবু অল্প বয়সে বাবা মাকে হারিয়ে বড় ভগ্নীপতি কালী কুমার চ্যাটার্জীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন। রাস বিহারীবাবু ও শঙ্কর বাবু রাজ বাড়ীর বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন কিন্তু শিশির বাবু অত্যন্ত সরল জীবনযাপন ভোগ করতেন। কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় পেশায় একজন উকিল ছিলেন। শিশির বাবু চিরকুমার ছিলেন তাহার অপর ভগিনীর পুত্র হলো বর্তমান সিনেমা জগতের ভিক্টর রায়। ভিক্টর রায় তাঁর মামার আপত্য স্নেহে মানুষ হয়েছেন। এই সময় কালীকুমার চ্যাটার্জী কলিকাতায় উকিলের চাকুরীরত অবস্থায় হ্যারিংটন ষ্টেটের রাজা শরৎচন্দ্রের সাথে বসবাস আরম্ভ করেন। একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে রাজাবাবু এই সময় মদ, গাজা ও বিভিন্ন নেশায় সব সময় আসক্ত হয়ে থাকতেন। শিশির বাবুর সহযোগিতায় কালী বাবু তার উকিল বুদ্ধি ফলিয়ে রাজার কাছ থেকে Power of Attorney (আমোক্তার নামা) -র মূলে চাঁচল রাজ ষ্টেটের কৌশলে চাঁচল রাজ ষ্টেটের ম্যানেজারের পদ দখল করেন নেন। পরবর্তী কালে শিশিরবাবু দুঃখ করে বলেন। আমি খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছি। উকিলবাবু কালীকুমার চ্যাটীর্জী চাঁচলে এসে খুটি গেড়ে বসলেন আর রাজা বাবুর মদ ও গাজায় পয়সা এবং কর্মচারীদের বেতনাদি মাসে মাসে কোলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। নেশা গ্রস্থ হয়ে দুঃখে শোকে দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী হয়ে ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে চাঁচলের শেষ রাজা শরৎ চন্দ্র রায় পরলোক গমন করেন।

১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমিদারী অধিগ্রহণ আইন তথা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ হলে এবং আদালতের একটি মামলায় চাঁচলের জমিদারিটি মোট ছয় (৬) টি অংশে ভাগ হয়। রাজা শরৎচন্দ্রের তিন (৩) দৌহিত্র তিন ভাগ, পুত্রবধূ মুক্তাকেশী দেবী ১ ভাগ, রাজার একমাত্র জীবিত ২ কন্যা ১

চাঁচল রাজ প্রসাদ

শিবরাম পর্ব
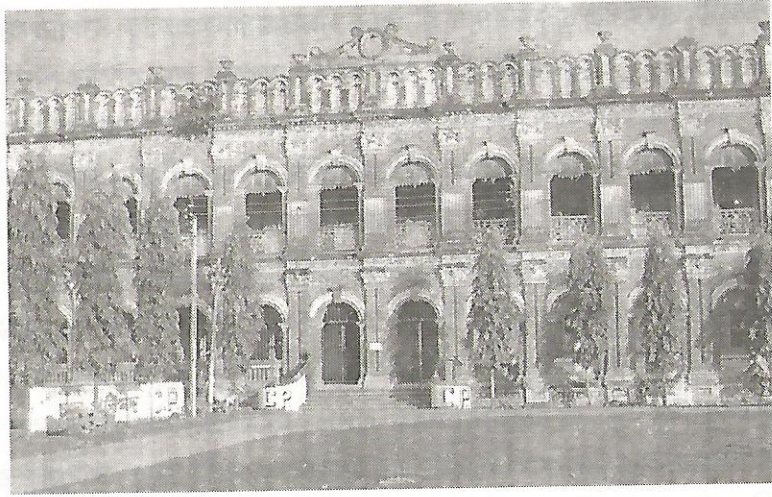
আমি বর্তমানে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের একজন করনিক (Dealings Clerk) আমাদের বিদ্যালয়ের গুদাম ঘরে গিয়ে বহু খুজেছি' ১৮৮৮-১৯২০ সাল পর্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তির খাতাটি পাওয়া যায় নাই। সেই জন্যই আমরা বলতে পারি না শিবরামের প্রকৃতজন্ম তারিখ কোনটি। "ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা" - বই টিতে কবি লিখেছেন।

"বঙ্গাব্দ তেরশ দশ প্রান্তে রবিবার
সাতাশে অগ্রহায়ন শিবের কুমার
শিবরাম জনমিল লীলা শঙ্খ বাজাইল
শিব হৃদে উপজিল আনন্দ-অপার।"

চাঁচলের রসরাজ রস সাহিত্যক শিশু শিল্পী শিবরাম বাবুর জন্মকাল সম্পর্কে বহুজনে বহুকথা বলে থাকে। কেও লিখেছেন তার জন্ম মাসির বাড়ি কোলকাতায় আবার কেহ বলেন তার জন্ম চাঁচল বা পাহাড়পুরে। ব্যাক ক্যালকুলেশন করে যে টুকু পাওয়া যায় ১৩ই ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে (মৃত্যু তারিখ ২৮/০৮/১৯৮০) শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম তাঁর মাসির বাড়িতে কোল কাতায় এই কথাটাই বেশি সত্য বলে মনে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার চোয়া গ্রামে শিবরামের পিতৃ নিবাস ছিল। বড়রানী সিদ্ধেশ্বরী রবোন অর্থাৎ বিদ্ধ্যেশ্বরীর দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলের বংশ ধরগন বর্তমান পাহাড়পুরে বসবাস করছেন এবং শিবরামের পিতা অর্থাৎ শিব প্রসাদ বাবু রানী সিদ্ধেশ্বরীর ডাকে চাঁচলের পুরাতন রাজবাটিতে অর্থাৎ হিন্দু হোষ্টেল ও রানীদিঘি লাগোয়া এলাকায় চলে আসেন। শিবরামের পিতা আত্মভোলা ছিলেন, বিষয়ের প্রতি তিনি খুব বেশি অনুরাগী ছিলেন না। দুই ভাই শিবরাম ও শিবসত্য চাঁচলেই তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের লেখা পড়া করেন। শিবরাম চক্রবর্তীর মাতার নাম ছিল শিবরানী। একসময় জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র হাতিন্ডা পরগনাটি

শিবরামের পিতা শিব প্রশাদের নাম বরাবর লিখিত ভাবে করে যান কিন্তু পরবর্তীতে রাজা শরৎচন্দ্র দাদাকে বলে তুমি আত্মভোলা সরল মানুষ তোমার দ্বারা এই জমিদারী কর্ম হবে না বলে এককালীন ২৫,০০০ (পঁচিশ) হাজার টাকা দিবেন বলে পরগনাটি ব-কলমে হাতিয়ে নেন। যা হোক এই পুরাতন রাজবাটির পেছনের দিকে মহাফেজ খানায় কয়েক খানা ঘরেই কেটেছে শিবরামের বাল্য কাল।

শিবরামের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। আনন্দ বাজার পত্রিকা সংকলন ১৩২৮-১৪০৩ এর প্রবন্ধ খন্ডের লেখক পরিচিতিতে শিবরামের জন্মস্থান চাঁচলের পাহাড়পুরে বলেছেন কিন্তু শিবরামের প্রকৃত জন্মস্থান কলকাতার নয়নচাঁদ দত্ত লেনের মামার বাড়িতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "বাঙালীর মনীষা" দ্বিতীয় খন্ডে শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম সাল ১৯০২ সাল বলা হয়েছে। সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" ১৯৯৯ সালে আনন্দ সংস্করনে শিবরামের জন্মসাল ভুল বশতঃ ১৯০৫ সাল দেখানো হয়েছে। কোরক সাহিত্য পত্রিকায় বইমেলা ১৯৯০ সংখ্যায় শিবসত্য চক্রবর্তীর সৌজন্যে 'নিজের দিকে ফিরে' শিবরামের সংক্ষিপ্ত জীবন সরনীতে ও ১৯০৫ সাল লেখা হয়েছে। কিন্তু এই লেখকের মৃত্যুর বহূপূর্বে ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা বই টিতে লেখক নিজেই লিখেছেন ১৩১০ সালের ২৭ শে অগ্রহায়ন অর্থাৎ ১৯০৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তাহার প্রকৃত জন্ম তারিখ ছিল। শিবরামের পিতা শিবপ্রসাদ একবার সংসার ছেড়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেরান তারপর বহুদিন আত্মভোলা মানুষটি আবার সংসারে ফিরে আসেন। নতুন রাজ বাড়ী প্রস্তুত হলে রাজাবাবু পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ীতে শিবরামের পরিবারকে ফেলে রেখে চলে যান। এই সময় পরিবারটি খুব দুঃখ কষ্টের মধ্যে একমাত্র মাসোহারার টাকায় সংসারের খরচ-খরচা চলত। শিবরামের বাল্যকালের প্রাথমিক শিক্ষাগুরু হয় রামনাথ পন্ডিতের কাছে। পোড়োবাড়িটির একপাশে থাকতো শিবরাম বাবুর পরিবার অন্য দিকের কয়েকখানি ঘরে ছিল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের হোষ্টেল এবং হোষ্টেলেই থাকতেন কান্তিবাবু এবং কামাখ্যা চরন নাগ মহাশয়। এদের সান্নিধ্যেই বড় হতে থাকে শিশু শিবরাম। শিবরাম মাঝে মাঝেই গণিত শিখতে যেতেন মুসলমান হোষ্টেসল কাবিল

হোসেনের কাছে। এই সময় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ পরিবারকে নিয়ে লেখা পরগাছা বইটি লেখেন। ক্রমে ক্রমে শিশু শিবরাম কৈশোরে পা দিলেন। ১৯১৩ সালে শিবরামকে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হল। ডানপিটে দুঃষ্টু ছেলেটি মন দিলেন লেখাপড়ায়। অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় কলিগ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে কোদলার মাঠ পেরিয়ে শিবরাম চলে যেতেন কলিগ্রামে। বন্ধুদের মুখে শুনেছিলেন সুশীল লাহিড়ীর বাড়িতে নাকি অনেক বই আছে। শিবরাম তার বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝেই কলিগ্রাম থেকে বই এনে পড়ে নিতেন। হোষ্টেলে বন্ধুদের সাথে থাকার সময় শিবরামের প্রথম গল্প নি খরচায় জলযোগ বইটি লেখে তার বাল্যকালের প্রাণের বন্ধু বিষ্টু প্রসাদ সুকুলের নামে উৎসর্গ করেন। কবি লেখক তাদের বাড়ি থেকে বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝেই কুকুর দিঘির পাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতেন মহানন্দা নদীর পাড় ঘেসে পাহাড়পুর সতীঘাট শ্মশান পর্যন্ত। পুরাতন রাজপ্রাসাদের একধারে ছিল স্কুলের হিন্দু বোর্ডিং ও ছেলেদের হোষ্টেল আর সেখানেই তাঁহার বাল্য বন্ধু তারাপদ সাহেব, পিয়ারী, পুন্য, শ্রী মোহন মিত্র, শরৎ ঝা থাকতেন লেখাপড়ার সুবাদে। বন্ধুদের মধ্যে বিষ্টু সুকুল ও শিবরাম-ই ছিলেন একটু ডানপিটে আর সাহসী। চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেল থেকে বর্তমান বাজার দিয়ে পথটি সোজা বর্তমান নজরুল বাসষ্ট্যান্ডে গিয়ে 'ফেরিঘাটে' উঠত। সরকার মেডিক্যাল ষ্টোর্স এর পাশে বর্তমান সেঁতুটি পরবর্তী কালে হয়েছে। এই সোজা পথটির মাঝা মাঝিতে অর্থাৎ বর্তমান 'নন্দিতা সুইটস্' বা পাপ্পুর ছাতার দোকানের পাশেই ছিল চাঁচলের পুরাতন বানিজ্যার নামকরা মিষ্টির দোকানটির অবস্থান। বানিজ্যার দোকানের রসগোল্লার প্রতি লেখক শিবরামের খুব লোভ এবং দুর্বলতা ছিল। রাজপরিবারের প্রিয় হাতি মোহন প্রসাদ পাগলামি করলে সেদিন বানিজ্যর দোকানের বানিজ্য খুব ভালো হত অর্থাৎ দুই কড়াই রসগোল্লা রাজাবাবু নিজে হাতে মোহনপ্রসাদকে খাইয়ে শান্ত করতেন। এই বানিজ্যা নামে ব্যবসায়ী টি মিষ্টির ব্যবসা করবার জন্য তিনি সুদূর বাকুড়া থেকে এখানে এসেছিলেন। এখন এই পরিবারটি আর নেই বহু দিন আগেই এখান থেকে চলে গেছেন।

একদিন কয়েকজন বন্ধুর সাথে কুকুর দিঘির পাড় দিয়ে শিবরাম বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়পুর শ্মশান ঘাটে (সতীঘাটা শ্মশানে) গিয়ে দেখেন একটা আস্ত মড়া (মৃতদেহ) নদীর পাড়ে পড়ে রয়েছে। এই মড়াটা দেখেই হাবুদা বলল "কেউ যদি আজ রাত্তিরে একলা এখানে এসে মড়াটার বার করা এই ডান হাতের আঙুলে একটা লাল সুতো বেঁধে দিতে পারে তাকে আমি রসগোল্লা খাওয়াবো। গরম গরম রসগোল্লা বাজি রাখলাম।" এই কথা শুনেই শিবরাম লাফিয়ে উঠেছিলেন রসগোল্লার লোভে রাজি হয়ে গেছিলেন। কথা মত একহাড়ি রসগোল্লা এনে রাখা হয়েছিল টেবিলের ওপর এবং হাবুদা ঘড়িতে অ্যালাম দিয়ে রাখেন। পরের ঘটনাটি সকলের জানা পরবর্তী তে বিষ্ণু প্রসাদ সুকুলকে নিয়েই "অ-দ্বিতীয় পুরস্কার" গল্পটি শিবরাম লিখেছিলেন। (শিবরামের সমগ্র) মাত্র দশ বছর বয়সে বিনা চিকিৎসায় শিবরামের ভাই শিবচরন পাহাড়পুরে মারা যায় ফলে পরিবারটি দুঃখে কষ্টে খুব ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় রাজবাড়ীর থেকে মাসোহারা একশত টাকা বন্ধ হয়ে গেলে শিবরামের বাবা মা ও দাদা পাহাড়পুরে নিজ আত্মীয়দের সাথে থাকতেন এবং শিবরাম বন্ধুদের সাথে হোস্টেলে লেখাপড়ার সুবাদে থেকে গেলেন কারন রাজবাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। এই ভাবেই অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েই শিবরামের শিব্রামীয় লেখক সত্ত্বার শিল্পী প্রতিভা বেঁচে ছিল। নিত্য-নতুন বই পড়ার নেশায় শিবরাম নিয়মিত যেতেন কলিগ্রামের ভারতী পাঠভবন লাইব্রেরীতে। কলিগ্রামের লাহিড়ী পরিবারের সহযোগিতায় মুরলী নামক একটি পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকা টি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৩২৮ সালের ১৭ই ভাদ্র। এই সংখ্যায় শিবরামের প্রথম কবিতা জাগরনী প্রকাশ পায়। পুরো পত্রিকাটি ছিল হাতে লেখা। মুরলীর সম্পাদক ছিলেন তারাপদ মৈত্র এবং সহঃ সম্পাদক ছিলেন রাম রাঘব লাহিড়ী। কলিগ্রামের ভারতী ভবন সাধারন পাঠাগারে এখনও শিবরামের হাতে লেখা কয়েকটি কবিতা অ-প্রকাশিত অবস্থায় রয়ে গেছে আজও। মুরলীর প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩২৯) ২৭ পৃষ্ঠায় তরুন কবি শিবরামের কামনা কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ—

"কামনা"

– শিবরাম চক্রবর্তী

সকালে যাই শুন্য হৃদি লয়ে,
কতই আশা করে।
রাত্রে আমি পূর্ণ হৃদি বয়ে,
মুগ্ধ মম ঘরে।
কতই প্রেমে রসে হৃদয় পাতে,
দিচ্ছ ভরে পুলক বেদনাতে।
মুক্ত আপন হাতে,
জীবন আমার উঠছে ভরে ভরে।
ভিক্ষা কত চাইনু কতই কানে,
তোমার চরন তলে।
বঞ্চিয়া যে আমারে বাঁচালে,
তোমার প্রেমের বনে।
আমার সাধে উঠত যাহা পড়ে,
প্রতিপালেই বাঁধত যে তার মোরে।
নিবিড়তর করে,
স্রোত হারাতাম মিথ্যা পালের দলে।
আর কিছুনা মুক্ত রাম শুধু,
আমার জীবন খানি।
সকল ক্ষনেই সঙ্গে থাক বঁধু,
শোনাও তব বানী।
সৌন্দর্যেরই স্বপ্নপুরী মাঝে,
জীবন বীনায় গান খানি গো বাজে।

নিশি দিনই বাজে,
যেন টানে তোমারই হাতছানি।
জীবন আমার দলে দলে,
রূপে বসে ভরে।
যেন শেষে তোমার চরন তলে,
পূজো সাঙ্গ করে।
এই কামনা সব কল্পনার বড়,
গন্ধ তাহার থাকুক চিরতর।
সবাই খুসী করে,
ফোটার শেষে যাবে যখন ঝরে।

রাজবাড়ীর তোষা খানার পাশেই সিদ্ধেশ্বর বাবু নামে এক ডাক্তারের পরিবার বাস করতেন। এই ডাক্তার বাবুর চারটি মেয়ে ছিল তার মধ্যে রিনি ছিল শিবরামের সমসাময়িক এবং বাল্য প্রেমিকা। রিনীর সাথেই তরুন কবি কখন নয়া দিঘির পাড়ে আবার কখনো শিউলী গাছের তলায় গিয়ে বসতো আবার কখনও তাদের বিশাল ছাদে উঠে বসতো দুজনায়। কলিগ্রামের কৃষ্ণচরন সরকার, রামরাঘব লাহিড়ী রাম নিধি মজুমদার ও জগবন্ধু সরকার প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামী পান্ডাদের অনুপ্রেরনায় স্বাধীনতার মন্ত্রে তরুন কবির মুখে জাগরিত হতে থাকে। একবার দুর্গাপূজার সময় শিবরাম নাকি ইচ্ছে করেই পূজার প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয় তাতে নাকি প্রতিমা সহ প্যান্ডেলটি সব পুড়ে ছায় হয়ে যায়। এই ঘটনায় কলিগ্রামের যুবকরা রেগে গিয়ে শিবরাম মারতে চাইলে লাহিড়ী পরিবারের লোকেরাই তাঁকে বাঁচিয়ে দেয়। এর পরই শিবরামকে কলিগ্রাম ছাড়তে হয় চিরতরে। ১৯২০ সালে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে ম্যাট্রিকের টেষ্ট পরীক্ষায় বসলেও ১৯২১ সালের ফাইনালে আর বসা হয় নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরনায় ১৮ বছর বয়সেই চিরতরে চাঁচল ছেড়ে চলে যান রিনির চিঠি পেয়ে রিনীর টানেই। আবার কেও কেও বলেন চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার

বিতরনী অনুষ্ঠানে এক ইংরেজ সভাপতিত্ব করছিলেন ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে। তখন তিনি ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে একটি কটুক্তি করেন ফলে তরুন শিবরাম ইংরেজ সাহেবটিকে মারতে উদ্যত হন কিন্তু লোকজনের জন্য তা সম্ভব হয় নি। সেদিন সারারাত্রি রিনীদের বাড়ি লুকিয়ে থেকে খুব ভোরে রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে সামসী ষ্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ী চেপে কলকাতায় চলে যান। কলকাতা গিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন ১৩৪ নং মুক্তারাম বসু ষ্ট্রীটের এক মেস বাড়ীতে। সেখানেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকেছিলেন এই রসরাজ-রস সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় ১৮/১৯ বছর বয়সে শিবরামের প্রথম কবিতা 'কোকিল ডাকে' ভারতীতে প্রকাশ পায়। ডঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন (১৩৭৮) গ্রন্থে লিখেছেন ১৯২১ সালে মে-মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই তরুনকবি মালদায় এসেছিলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাথে তাঁর এখানেই সাক্ষাৎ হয়েছিল। এখান থেকে তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ি এবং পরে রাজসাহী যান। বাবার মৃত্যুর পর শিবরামের মা ও বড় দাদা শিবসত্য কোন্নগড় ষ্টেশনের পাশে একটি বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তীতে শিবসত্য কোন্নগড় স্কুলে হেড মাষ্টার এবং পরে কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। পাহাড় পুর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় শিবরামের মায়ের হাতে ছিল শেষ সম্বল নগদ ১৫,০০০ টাকা এবং কিছু গয়নাগাটি ছাড়া আর কিছুই না। রাজা শরৎচন্দ্রের ওপর চরম রাগ ছিল এই তরুন কবি শিবরামের। অত্যাচারী, প্রজানিপিড়ক, সেই স্বার্থ লোলুপ, স্বেচ্ছা চারী, ক্ষমতাদর্পী ও সন্দেহ বাতিক রাজা কাকা এবং চাঁচলে জমিদারির অধঃস্তন কর্মচারীদের মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য ১৯২৫ সালে রাজা শরৎচন্দ্রের নাম বদল করে ''জমিদারের রথ'' নামে এই তরুন কবি শিবরাম প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন। ১৯২৫ সালে আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম ছিল ''ছেলেবয়সে''। জমিদারের রথ বইটি রাজা শরৎচন্দ্র ইংরেজ বাহাদুরদের সহায়তায় প্রকাশিত বই ও প্রকাশনা করা উভয়ই আইন করে বন্ধ করে দেন। জমিদারের রথ বই টিতে জমিদার শরৎচন্দ্র হয়েছেন শরদিন্দু আর শিবপ্রসাদ হয়েছেন মহাদেব প্রসাদ এবং জয়ন্তের আড়ালে রয়েছে শিবরাম

চক্রবর্তী। জমিদারের রথ বইটিতে উল্লেখিত বনাঞ্চল হল আসলে ৬৮ নং সিঙ্গিয়া মৌজার বিশাল আমবাগান ও জঙ্গলা কীর্ণ বনভূমি। জমিদারের রথ বইটি মালতীপুর টাউন লাইব্রেড়ীতে এক কপি ছিল কিন্তু এখন তার ও কোন হদিস নেই। রাজা ঈশ্বর চন্দ্র এবং বড়রানী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ডাকে একদা শিবরামের পিতা মাতা চাঁচলে এসেছিলেন। তাঁর বাবা শিবপ্রসাদকেই রাজবাড়ীর দত্তক নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু শিবপ্রসাদ বাবু ছিলেন বিষয় বিরাগী আত্মভোলা মানুষ ফলে শিবরাম পরবর্তী কালে মাসীর সম্পত্তি পেয়ে জমিদার হতে পারতেন কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এই তরুন কবি হয়েছেন প্রজাদের নয়, রসিক জনের রাজা। চাঁচলের শিশু শিল্পী ও লেখক রাজাধিরাজ রস রাজ, রস সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী। বাল্যকাল থেকে রাজবাড়ীতে থেকে জমিদারের শোসন, শাসন দেখে কিশোর বয়স থেকেই শিবরাম হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবাদী যুবক। অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ও তিনি সোচ্চার হয়েছেন কখন কখন কিন্তু বড় নেতা হতে পারেন নি তিনি। সবকিছুকে হারিয়ে ছিলেন বলে তার কোনদিন সেসব নিয়ে কোন অনুশোচনা হয় নি। বহু অভাব অনটনের মধ্যে থাকলেও কেও তাকে জিজ্ঞেস করে যখন বলেছেন কেমন আছেন শিবরাম বাবু। প্রত্যুত্তরে লেখক উত্তর দিতেন ফাস্ট ক্লাস।

তাইতো এই প্রতিবাদ মুখর কবি লিখেছেন তার ছয় (৬) কোটি হিন্দু সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য পতিত ভাইদের মুক্তি কামনায় "পাখির খাঁচা" কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ চারটি স্তবকে লিখিত কবিতাটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্যঃ—

১) শুনরে কুশল, আনবে মুষল/ভাঙরে পাখির খাঁচা/যুগান্তরের শিকল ভেঙে/ত্রিশ কোটিরে বাঁচা/উন্নত শির আজযে সবে/ ওদের মাথাই নিচু রবে?/ কোথায় কে রে আছিস মানুষ/কাররে হৃদয় কাঁচা/ভাঙরে পাখির খাঁচা।

২) সরল প্রেমে নিজের ভায়ে/পারেন মুক্তি দিতে/মোক্ষ তারাই নেবেন বটে/চরম চালাকিতে/আঁকড়ে ধরে স্বার্থ যন্ত্র/মিথ্যা পূজা মিথ্যা মন্ত্র/ব্যর্থ তোদের সকল তন্ত্র আগাগোড়াই ধাঁচা/ভাঙরে পাখির খাঁচা।

৩) জাতি ভেদের যাতায় যে রে/ত্রিশ কোটিরে পেশে/উড়িয়ে দিবি সত্য করে/একটু কেঁদে হেসে/নবীন যারা আনরে তারা/ভাগীরথী প্রেমের ধারা/জীবন মরা অবশ ভায়ে/ পরশ দিয়ে বাঁচা/ ভাঙ্‌রে পাখির খাঁচা।

৪) রবেই কিগো সনাতনের/জীর্ণ ছেঁড়া কাঁথা/হবে নাকি হেথায় বিভুর/অমল আসন পাতা/বাজবে নাকি সত্য বিষান/উড়বে নাকি প্রেমের নিশান/বিজয় আসন পাতে না প্রাণ/সবার চেয়ে সাঁচা? ভাঙ্‌রে পাখির খাঁচা।

পরবর্তীতে ১৯২৯ সালে 'মানুষ' এবং 'চুম্বন' কবিতা গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়।

১৯২৫ সালে 'জমিদারের রথ' এবং 'ছেলেবয়সে' উপন্যাস দুটি লেখার আগে কবি শিবরাম 'যুগান্তর' ১৯২৩ এবং আত্মশক্তি ১৯২৩ এই দুটি রাজনৈতিক পত্রিকা সম্পাদন করেন।

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক এই লেখকের লেখা বিক্রি করে যেদিন প্রথম ১৫ টাকা পেয়েছেন সেদিন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল তার লেখনীর কলম। শিবরামের লেখা ছোট গল্প গুলির নাম নিম্নরূপ।

প্রথম খন্ড থেকে

হাতির সঙ্গে হাতা হাতি, অশ্ব থামা হতঃ ইতি, ঘোরার সঙ্গে ঘোরাঘুড়ি, অঙ্ক সাহিত্যের যোগফল। জোড়া ভরতের জীবন কাহিনী, হাতাহাতির পর, মন্টুর মাষ্টার, নরখাদকের কবলে, পরোপকারের বিপদ, শ্রীকান্তের ভ্রমন-কাহিনী, শুঁড় ওয়ালা বাবা, হরগোবিন্দের যোগফল, বিহার মন্ত্রীর সান্ধ্য বিহার, পাতালে বাদর পাঁচেক, বক্কেশ্বরের লক্ষভেদ, একটি স্বর্ণঘটিত দুর্ঘটনা, একটি বেতার ঘটিত দুর্ঘটনা, আমার সম্পাদক শিকার, আমার ভালুক শিকার, আমার ব্যাঘ্র প্রাপ্তি, ভালুকের স্বর্গলাভ, কাষ্ঠ কাশির চিকিৎসা, গোখলে গান্ধিজী এবং গোবিন্দবাবু, দাদুর ব্যায়াম সোজা নয়, দাদুর চিকিৎসা সোজা নয়, বিজ্ঞাপনে কাজ দেয়, প্রবীর পতন, জাহাজ ধরা সোজা নয়, শিবরাম চকরবরতির মত, কথা বলার বিপদ, নিখরচায় জলযোগ, নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ, কল্কে কাশির অবাক কান্ড, হর্ষবর্ধনের সূর্য দর্শন, বিগরে গেলেন হর্ষবর্ধন, হর্ষবধনের বাঘ শিকার, ডাক্তার ডাকলেন হর্ষবর্ধন, হর্ষবর্ধনের কাব্যচর্চা, ধনং কৃত্বা, মাসতুতো ভাই, ছার পোকার মার।

দ্বিতীয় খন্ড থেকে

কল্কে কাশির কান্ড, কালান্তক ল-ল ফিতা, পিগমানে শূয়োর ছানা, হাওড়া-আসতারেল দুর্ঘটনা, স্যাভাতের সাক্ষাত, পন্ডিত বিদায়, ঘটোৎকচ বধ, যখন যেমন তখন তেমন, হারাধনের দুঃখ, পঞ্চাননের অশ্বমেধ, একদা এক কুকুরের হাড় ভেঙেছিল, নকুড় বাবুর অনিদ্রা দূর, বিশ্বপতি বাবুর, অশ্বত্ব প্রাপ্তি, সমস্যার চূড়ান্ত, আলেক জান্ডারের দিগ্বিজয়, একলব্যের মুন্ডপাত, তারে চড়ার নানান ফ্যাসাদ, প্রকৃতি রসিকের রসিক প্রকৃতি, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ, পৃথিবীতে সুখ নেই, নাক দিয়ে নাকাল, নাকে ফোঁড়ার নানান কাড়া, ইঁদুরদের দুর করো, নিকুঞ্জ বাবুর গল্প, পাক ও নালীর বিপাক, অগ্নিমান্দ্যের মহোষধ, আস্তে আস্তে ভাঙো, টুক-টুকির গল্প, ম্যাও ধরা কি সহজ নাকি, চাঁদে গেলেন হর্ষবর্ধন, চেঞ্জে গেলেন হর্ষবর্ধন, গোফের জ্বালায় হর্ষবর্ধন, দোকানে গেলেন হর্ষবর্ধন, গোবর্ধনের প্রাপ্তি যোগ, হর্ষবর্ধনের চৌকিদারী, হর্ষবর্ধনের বিড়ম্বনা, হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা, মাসির বাড়ির আবদার, সোনার ফসল, গোলাদিঘিতে, হর্ষবর্ধন, হর্ষবর্ধনের পাখি শিক্ষা।

তৃতীয় খন্ড থেকে

দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ, বাড়ির ওপর বাড়াবাড়ি, পত্রবাহক হর্ষবর্ধনের হজম হয় না, হর্ষবর্ধনের অক্কালাভ, চোর ধরল গোবর্ধন, ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ, বৈজ্ঞানিক ভ্যাবাচাকা, চোখের ওপর ভোজবাজি, গোবর্ধনের কেরামতি, অ-দ্বিতীয় পুরস্কার (গল্পটি চাঁচল হোষ্টেলে লেখেন) , চেয়ার ম্যান চারু, ঘুমের বহর, পরিত্যক্ত জলসা, সীট আরাম সীটারাম, মারাত্মক জলযোগ, নরহরির স্যাভাত, জুজু, বাসের মধ্যে আবাস, ছত্রপতি শিবাজী, প্রানকেষ্টর কান্ড, আমার বইয়ের কাটতি, শিশুশিক্ষার পরিনাম, বই নিয়ে হৈ চৈ, ভোজন দক্ষিণা, লাভ পুরের ডিম, এক দুর্যোগের রাতে, মাথা খাটানোর মুস্কিল, ঢিল থেকে ঢোল, পড়শীর মাথা, ভাগনে যদি ভাগ্যে থাকে, গ্যাস মিত্রের গ্যাস দেওয়া, ডিটেকটিভ শ্রী ভক্তিহরি, ভুতে বিশ্বাস করো? লক্ষন এবং দুর্লক্ষন, ভূত না অদ্ভুত, এক ভুতুরে কান্ড, ধূম্রলোচনের আবির্ভাব, মাসতুতো ভাই, গদাইয়ের গাড়ি, হাতি মার্কা বরাত, ট্রেনের ওপর

মেরামতি, রিকসায় কোন রিস্ক নেই, খবরদারি সহজ নয়, কলকাতার হালচাল, স্বামী মানেই আসামী ইত্যাদি।

এই রসসাহিত্যিক কয়েকখানি নাটক লেখেন সেগুলি হল- যখন তারা কথা বলবে, প্রাণ কেষ্টর কান্ড, পন্ডিত বিদায় ইত্যাদি।

উপন্যাস

জমিদারের রথ, ছেলেবয়সে, সমর্পিতা, ফুটলো বিয়ের ফুল, শুক্কবর্তী, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, হর্ষবর্ধনের জয়ধ্বনী (কিশোর), যে নদী মরুর পথে ইত্যাদি।

প্রবন্ধ ঃ মস্কোর বনাম পন্ডিচেরী, মানুষ।

কাব্য ঃ যখন তারা কথা বলবে, চাকার নীচে।

আত্মজীবনী

ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা বা ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর। একের পর এক লিখে চলেছেন তার লেখার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাংলার অগণিত পাঠক সমাজের মধ্যে। তিনি নাটক, উপন্যাস, বড়গল্প, কাব্য লিখলেও তার পারদর্শিতা ছিল শিশু, কিশোর এবং যারা বড় কিন্তু মনের দিক দিয়ে যারা শিশু মনের অধিকারী ছিলেন তাঁদের জন্যই শিবরাম বাবু লিখে গেছেন বহু হাস্য কৌতুক রচনা। তাঁহার বাক্যভঙ্গি ও বাচন ভঙ্গী তথা লেখার রচনা শৈলী ছিল অত্যন্ত সুন্দর।

শিবরামের বাল্য প্রেমিকা কলকাতায় চলে গেলেও রিনি শিবরামকে একে বারে ভুলে যায় নি। তাইতো দুরে চলে গেলেও চিঠি দিয়ে ডেকেছেন আর এই চিঠি পেয়ে কবি লিখেছেন- কোকিল ডাকে নামক কবিতাটি।

কোকিল ডাকে ভোরের ফাঁকে আম্রশাখে
ভোরের বাতাস যায় যে চিরে......
ব্যথায় তীরে হঠাৎ ধীরে।
সেই ব্যথা কি যায় ছারিয়ে চারিদিকে?

যায় হারিয়ে স্মৃতির পাকে?
নাড়িয়ে দেয় কি জীবন টাকে?
মনে পড়ে ছেলেবেলার বন্ধু খেলার
মিলন মেলার সঙ্গিনীকে
প্রতিদিনের সঙ্গিনীকে
কথায় গভীর ব্যথায় নিবিড়
সেই মোহিনীর সঙ্গ টাকে
কোকিল ডাকে।

কলকাতায় যাওয়ার পর কবি দেখা করেছেন রিনির সাথে অনেক খুজে পেয়েছেন তার সাক্ষাৎ। পরবর্তী কালে রিনী তার বিয়েতে শিবরামকে নেমন্তন্ন করেছিলেন এবং আত্মভোলা শিবরাম তাঁর বাল্যকালের সঙ্গিনী আর রঙ্গিনীকে শেষ দেখা দেখতে গেছেন গভীর ব্যথা বুকে নিয়ে। এই আত্মভোলা রসিক লোকটির কোন আত্মগরিমা আত্মগর্ব কোন দিনই ছিল না। কেও জিজ্ঞেস করলে বলেছেন আমার মস্তিস্ক অত বর্ধমান নয় বরং চব্বিশ পরগনা। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মত তিনি কোন দিন অত বড় হতে চাননি তিনি বলেছেন- "আমি হতে চাই আমি"

রাজা শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ২৫,০০০ টাকা পাইবার জন্য হাইকোর্টে মামলা করেন। এই মামলাটি বেশ কিছু দিন চলে মামলার খরচ বাবদে রাজাবাবুর একটি তারিখে বা একদিনে ৫০০-১০০০ খরচ হত কিন্তু শিবরামের খরচ হত ৫-১০ টাকা মাত্র। কিছু দিন মামলাটি চলার পর রাজা শরৎচন্দ্রকে কোর্টের কাঠগরায় তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। কোর্টের মহামান্য বিচারক বলেন তোমার সাক্ষ্য দেওয়ার লোক কে ডাক তখন শিবরাম বলে আমার সাক্ষী এবং আমার আসামী রাজা বাবু নিজেই। কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বাবু বললেন আমি তাকে ২৫ হাজার টাকা দিতে চেয়েছি লাম তবে তাকে টাকাটা দিবই এই রকম কোন লিখিত কোন প্রমান দিই নি। শিবরাম তখন মনের দুঃখে কোর্টের কাঠগরায় দাড়িয়ে বলেছিলেন। মহামান্য কোর্ট লিখুন চাঁচল রাজ বাড়ির ইতিহাস বেইমানির

ইতিহাস। অর্থাভাবে শিবরাম অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছিলেন। অনেক দুঃখে কষ্টে তাহার মাও বিনা চিকিৎসায় কোন্নগড়ে শিবসত্য নামে দাদার কাছে মারা যায়। মোকদ্দমায় জিতে গেলে যদি ২৫,০০০ টাকা পেতেন তাহলে শিব রাম বাবু বিশ্বভ্রমনে বেরিয়ে যেতেন। এজীবনে তার চাওয়া পাওয়ার আর কিছু ছিল না। তাঁর নিজ আত্মীয় স্বজন বলতে কেও ছিল না। মাস তুতো খুরতুতো ভাই তাহার দূর সম্পর্কের ভাগ্না ছাড়া কোলকাতায় তার কোন নিকট আত্মীয় ছিল না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র চন্দ্র বসু স্বয়ং নিজে তার একটি কাগজ সাপ্তাহিক "আত্মশক্তির" সম্পাদকের ভার দিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো লোক শিবরামের রচনা শৈলী পড়ে সুভাষচন্দ্রের হাতে একটি চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। এই চিঠিতে পেনসিলে লেখা ছিল Sibram is a good writer of Bengali Prose পরের দিন নেতাজী সুভাষ শিবরাম কে বলেছিলেন তাহলে কাল থেকেই কাজে লেগে যাও। তার লেখার বহর বেড়ে চলল দিনের পর দিন। মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রিটে এই আত্মভোলা মানুষটির আগোছালো জীবনের মেস বাড়িতেই চাঁচলের শিবরাম চক্রবর্তী হয়ে গেলেন "শিব্রাম চক্কোত্তি"- তার বাক্যালাপ বাক্ চাতুয্য ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। একবার চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল লাহিড়ী তার মেস বাড়িতে দেখা করতে গেছিলেন। শিবরাম বাবু তাকে চৌকি বসতে দিয়ে নিজে বসেছিলেন মেঝেতে। এতে লাহিড়ী বাবু খুব অস্বস্তিতে পড়ে যান। তখন শিবরাম ব্যাপারটি অনুধাবন করে বলেন আপনি চৌকিতে বসেছেন অর্থাৎ চৌকিদার আর আমি জমিতে বসেছি কারন আমি জমিদার। শিল্পী শিবরাম ই-লেখক শিব্রাম হতে তাহাকে খুব সাহায্য করেছে। তাঁর অভিনব শিল্প কৌশল এবং লেখার মধ্যে শব্দচয়ন ও শব্দগুলিকে ভেঙে-ভেঙে বলার মধ্যে যে বাক চতুরঙ্গ লক্ষ্য করা যায় সেজন্য শিবরাম কে একজন ভালো সাহিত্যিক ও বলা যায়। হে অমর রসরাজ রসসাহিত্যিক হাস্যকৌতুক ব্যাঙ্গাত্মক অমর শিল্পী তোমাকে জানাই অজস্র প্রনাম।

"শিবরাম স্মরনে"

শিব-শিব রাম রাম তুমি শিবরাম,
লেখনীর ফলে তুমি হলে শিব্রাম।
সাহিত্য রসিক তুমি চাঁচলের রাজা,
শিশু পাঠকদের দিয়েছ গল্পের মজা।

তোমার লেখা ঈশ্বর-পৃথিবী আর ভালোবাসা,
ভারত বাসীকে স্বাধীন করার ছিল কত আশা।
তুমি শিবরাম হোক ডাক নাম,
পাঠক সমাজের বুকে থাক অভিরাম।

ভালোবাসার সঙ্গিনী আর বাল্যকালের রঙ্গিনীকে,
ভোরের বাতাসে কোকিল ডাকে তোমার স্মৃতি টাকে।
দর্জি পাড়ার জাতক তুমি সাহিত্য রসিক দর্জি,
মুক্তারামের মেস বাড়ী ছিল তোমার আপন মর্জি।

নাই বা হলে দেশের রাজা তুমি শিবরাম,
পাঠক মনের হয়েছে যে পূর্ণ মনস্কাম।
আমরা তোমায় ভুলিনী হে শিবরাম,
পূর্ণ হৃদয় ভরে জানাই অজস্র প্রনাম।

- মেঘনাদ দাস (লেখক)

'বসুমতি' পত্রিকায় 'বাঁকাচোখে' নামক ব্যাঙ্গাত্মক রচনা দিয়ে তার লেখনী জীবনের সূত্র পাত ঘটেছিল। আনন্দবাজার, তত্ত্ববোধিনী, কল্লোল, আত্মশক্তি, যুগান্তর ও ভারতী পত্রিকাতে ও তিনি লিখেছেন প্রচুর। তার লেখার খ্যাতি হিসাবে ১৯৬০ সালে মৌচাক এবং ১৯৭৫ সালে তিনি আনন্দ পুরস্কারে ভুষিত হয়েছেন। চাঁচলের হাসির রাজা এই অমর লেখক শিল্পী ২৮শে আগষ্ট ১৯৮০ সালে কোলকাতার

এস, এস, কে, এম হাসপাতালে একরকম আত্মীয় পরিজন হীন অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর কয়েকঘন্টা আগে ডাক্তারবাবু লেখককে জিজ্ঞাসা করেছেন- এখন আপনি কেমন আছেন শিবরাম বাবু। উত্তরে এই অমরশিল্পী বলেছেন ফাস্ট ক্লাস।

তথ্যসূত্র

★ ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা - শিবরাম চক্রবর্তী
★ শিবরাম রচনাবলী - ঐ
★ সমর পিতা - ঐ
★ মস্কো বনাম পন্ডিচেরী - ঐ
★ বাংলা ও বাঙালী - ডঃ স্বপন কুমার মন্ডল
★ শিবরাম স্মরনীকা - শিবরাম মেলা ২০০৬/চাঁচল
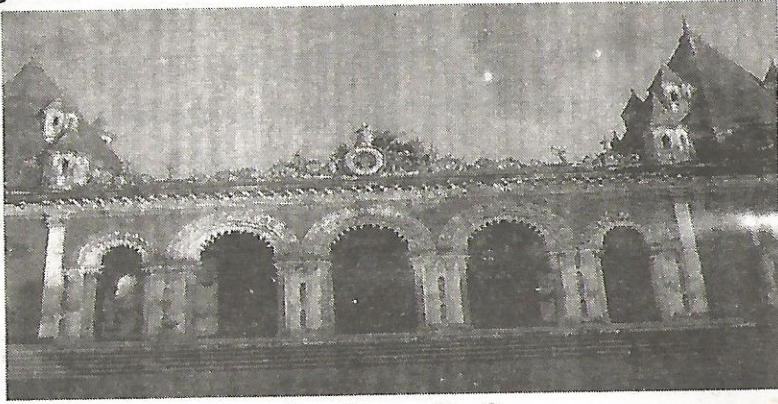
চাঁচল ঠাকুর বাড়ি মন্দির

চাঁচল ঠাকুর বাড়ির কথা

রাজা ঈশ্বর চন্দ্র বা তাহার পিতৃপুরুষগণ চাঁচল পুরাতন রাজবাটিতে বসবাস করতেন চাঁচল (৭০) রানিদিঘি লাগোয়া হিন্দু হোস্টেল এলাকায় দীর্ঘ দিন। বিগত ১৮৭২-১৮৮২ সাল মধ্যে রাজা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্যার স্টুয়ার্ট লয়েডের তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদের নবাব প্যালেসের অনুকরনে তৈরী হয় সিঙ্গিয়া মৌজায় (৬৮) এই নতুন রাজবাড়ি এবং তৎসংলগ্ন ঠাকুর বাড়ি। এই রাজবাড়ীর একতলা ঘরগুলির উচ্চতা প্রায় ১৮/২০ ফুট এবং দোতলা বাড়ির উচ্চতা প্রায় ৪০(চল্লিশ) ফুট। লালপোড়া ইট দিয়ে তৈরী হয়েছে এই রাজবাড়িটি চুন ও সুরকির সাথে আঠা জাতীয় কেমিক্যাল দিয়ে ইটগুলি গাঁথা হয়েছে। ভেতরের দেওয়াল মসৃন হলেও দেওয়ালের বাহির গাত্রে কোন পলেস্তারা করা হয়নি। প্রায় ১৫০ বছরের এই বাড়ির ইটের রং এখন ও লাল হয়ে আছে কোথাও একটুও নোনা বা শ্যাওলা লগেনি। মালদা জেলা স্কুলের ছাত্রাবাসা ও রাম নগর কাছারি বাড়ীও একই আদলে তৈরী হয়েছে। রাজবাড়ীর প্রধান ফটকের সিড়ির দু-পাশে স্থানীয় শিল্পী দিয়ে তৈরী হয়েছিল দুটি গ্রীসিয়ান শৈলী অনুকরনে দুটি বাতি ষ্ট্যান্ড হাতে নারী মূর্ত্তি। এই রাজবাড়ীর পাশেই রয়েছে ঠাকুর মন্দির উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রধান প্রবেশ পথের সামনে জনবসতি গড়ে উঠেছে বলে রাজবাড়ী ও ঠাকুরবাড়ি মন্দিরের সৌন্দর্য অনেকটা বিনষ্ট হয়েছে। রাজবাড়ীর দক্ষিণ অংশে রয়েছে চাঁচল ডিগ্রি

কলেজ ১৯৬৯ সাল থেকে অদ্যবধি বর্তমান। ঠাকুরবাড়ির প্রবেশ পথ পার হলে দুই পাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি ঘর পুরোহিত ও সহকারী পুরোহিতদের বাসস্থানের জন্য। তার পরেই বিশাল উঠোন দুই ধাপে এবং সিড়ি বেয়ে পূর্বদিকে মন্দির গৃহে প্রবেশ পথ। মন্দিরটির বামদিকে ও ডানদিকে বারান্দাসহ দুটি ঘর অবস্থিত। ছাদ লাগোয়া বারান্দার দেওয়ালে তৎকালীন রাজমিস্ত্রীদের সুক্ষ কারু কার্য্য রয়েছে। মূল গর্ভ দালানটির এক পাশ থেকে কৃষ্ণ-রাধিকা, লক্ষী-নারায়ন, মাঝে রাম সীতা, লক্ষন মহাবীর গৌর-নিতাই এবং শেযে সিংহবাহিনী হল রাজবাড়ীর কুলদেবতা (আগে ছিল সোনার প্রতিমা খুব ছোট আকৃতির এখন নেই) বলতে পারবো না ওটা কে নিয়ে গেছে, সে "রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই" পুরো রাজবাড়িটাই যখন বিক্রি হয়ে গেছে তখন ওকথা বলে কোন লাভ নেই। এই মন্দির গৃহের ছাদে দু-পাশে দুটি মূর্ত্তি সর্প কুন্ডলীর উপর রাধাকৃষ্ণ, তার দুপাশে দুটি মূর্ত্তি একটি লক্ষী ও অপরটি ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে, তার দুপাশে মালা হাতে দুটি পরি দাড়িয়ে রয়েছে। একসময় এই ঠাকুর বাড়িতে ভোগ এবং অন্নের ভোগ ও খিচুড়ি রান্না হত প্রচুর পরিমানে। বাবা বলতেন (১৯২৯-৩৫) সাল মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র (প্রায় ২৫০/৩০০) টিফিনে গিয়ে ঠাকুর বাড়িতে ভোগ পেট ভরে খেয়ে আসত প্রতিদিন। এটি বর্তমানে চাঁচল ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। অফিসিয়াল ট্রাস্টি বোর্ডের অছি শ্রী পিনাকী জয় ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে চাঁচল ঠাকুর বাড়ি, মালতীপুর কালী মন্দির এবং পাহাড়পুর চন্ডি মন্ডপের পূজো পরিচালিত হয়ে আসছে। বহিরাগত দর্শকদের এবং আত্মীয় স্বজনদের কাছে চাঁচল রাজ ঠাকুর মন্দিরটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। দেওয়াল ও মন্দিরের কারুকার্য দেখে চোখ জুরিয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

☆ অতীতের মালদহ- প্রবাল রায়,

☆ জেলা মালদহের ইতিহাস- আবদুস সামাদ,

☆ ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা- শিবরাম চক্রবর্তী

গজানন শিবালয়- ১৩৭৪, গজানন কলোনী, চাঁচল

গজানন শিবালয়ের আত্মকথা

এটি চাঁচলে দূর্গাবাড়ী মোড়ের পশ্চিমে কুকুর দিঘির পশ্চিমদিকে বটগাছ টির পাশে অবস্থিত মৌজা চাঁচল-৭০, খং নং- ৭০৫ দাগ নং-৬৬৪ মোট জমি ১৫ শতক জমিটির প্রবেশদ্বারে ডানদিকে সাদা ধবধবে এই "গজানন শিবালয়" লেখকের ঠাকুরদার স্মৃতি রক্ষার্তে তদ জ্যৈষ্ঠ পুত্র শ্রী বিনোদ বিহারী দাস কর্ত্তৃক মন্দির টি নির্মান করা হয়েছিল বাংলা ১৩৭৪ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে। স্বর্গীয় গজানন মহালদার/দাস জন্ম ১৩০১ সাল মৃত্যু ১৩৮৪ সালের মাঘ মাস পুরাতন রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে জেলে পাড়ায় একটি মাটি কোঠা/পবর্ত্তীতে চুন-সুরকী দিয়ে তৈরী কাঠের তীরবর্গা ও পেটায় জলছাদ যুক্ত পোড়ো বাড়িতে একদা রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের রাজ দরবারে কাজ করতেন। বয়সে লেখক শিবরাম চক্রবর্তী থেকে প্রায় দশ বছরের বড় ছিলেন এবং রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের প্রিয় বিশ্বাস ভাজন ছিলেন। তিনি পেশায় কবিরাজ ছিলেন (কবিরাজ জি.এন.দাস/গজানন দাস) এবং ঘোড়ায় চেপে দূর-দূরান্তে কবিরাজী মতে চিকিৎসা করতেন। আমার জন্ম থেকে প্রায় ১৯-২০ বছর আমিও ঠাকুরদার সান্নিধ্য লাভ

করেছি। তিনি কোন দিন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেননি বাড়ীতেই তিনি ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্য পাঠ প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ লেখাপড়া করেছিলেন মাত্র। ৭৬-৭৭ বছর বয়সেও খালি চোখে তাঁহার সুর করে **"কৃত্তিবাসী রামায়ন"** পড়া আমাদের জেলেপাড়ার অনেক লোক আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা ভীড় জমাতেন। সেই কবিরাজ গজানন বাবু কোলকাতা থেকে মাত্র ৫ টাকায়, কৃত্তিবাসী রামায়ন খানি এনেছিলেন। তাঁহার সুর করে রামায়ন গানের কথা মনে পড়লে আমার মনে পড়ে যায় এস ওয়াজেদ আলীর ভারত বর্ষ গল্পটির কথা। প্রথম জীবনে তিনি একজন মৎসজীবি থাকলেও পরবর্তী কালে এই গজানন বাবু (দাদু) কবিরাজ হিসেবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সারাজীবনে তিনি মোট চার (৪টি) ঘোড়া ব্যবহার করেছিলেন। শিবরামের পঞ্চাননের অশ্বমেধ গল্পটি এই গজানন দাস (তিনি ইচ্ছে করেই পঞ্চানন) নামে ছেপেছেন। ঠিক যেমন করে শিবরাম বাবু "জমিদারের রথ" বই টিতে শরৎ বা ঈশ্বরচন্দ্র বা শিবরাম নাম গুলি সরাসরি ব্যবহার করেননি। আজ যেখানে গজানন শিবালয় মন্দিরটি অবস্থিত সেখানে বিগত ১৮৭০-৮০ সাল মধ্যে রাজা শরৎচন্দ্রের কুস্তি খেলবার জন্য ব্যবহৃত হত। রাজা শরৎ চন্দ্র তার যৌবন বয়সে পুরাতন রাজবাটিতে থাকাকালীন মন্দিরের পাশের তালুকদারের পুকুরটি একটি ডোবার মত ছিল এবং মন্দির এলাকাটি ছিল শরৎ চন্দ্র ও তার সঙ্গী পালোয়ান দের কুস্তি খেলার জায়গা। আপনারা শিবপদ লাইব্রেরীতে রাজা শরৎচন্দ্রের কালো মোটা মোটা মোচ ওয়ালা চেহারা নিশ্চয় দেখেছেন। দাদুর মুখে ও জনশ্রুতি থেকে জানা যায়যে হবিনগরের এক মুসলমান পালোয়ানকে আছরে মেরে ফেলেন এবং তাহার জীবনের ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য হন। একবার বিহারের দ্বারা ভাঙ্গা থেকে এক বিশাল চেহেরাধারী পালোয়ান রাজা শরৎচন্দ্রের নাম শুনে কুস্তি লড়তে চাঁচলে আসেন। সেই পালোয়ান কে রাজা শরৎচন্দ্র কুস্তি খেলতে খেলতে একেবারেই মেরে ফেলেন। এই মৃত পালোয়ানের মৃতদেহ বর্তমান রক্ষাকালী ঠাকুরের পেছনে মাটিতে পুঁতে ফেলেন কারন এই এলাকাটি ছিল রাজার পুরাতন লেবু বাগান নামে পরিচিত। তারপর এই মৃত্যু সংবাদ বিহারের দ্বারভাঙ্গায় পৌছলে সেখান থেকে কুস্তিগীর

পালোয়ানের প্রায় ১৫/২০ জন শিষ্য এক যোগে রাজাবাবুকে মেরে ফেলার জন্য চাঁচলে আসেন কিন্তু রাজাবাবু এই খবর শুনে বেশ কিছু দিনের জন্য গাঁ ঢাকা দিয়ে প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাকেন। রাজাবাবু কে না পেয়ে বিহারের পালোয়ানের দল কয়েকদিন চাঁচলে থাকার পর চলে গেলে এই ঘটনার অবসান ঘটে।

দেবরাজ ইন্দ্রের মন্দির গৃহ

যা হোক মহানন্দার ওপারে নতুন রাজবাড়ী তৈরী হলে ১৯০৪ সালে রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী গৃহ প্রবেশ করেন এ-কথা সকলের জানা আছে। পোড়ো ভাঙ্গা রাজবাড়ীতে শিবরাম বাবুর পরিবার কে দিয়ে যান রাজা বাবু। এর পর থেকেই চাঁচলের মানচিত্রে সিঙ্গিয়া মৌজার গুরুত্ব দিন দিন বাড়তে থাকে ৭০ নং চাঁচল মৌজার জমি গুলি রাজ ষ্টেট থেকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আমার (লেখকের) ঠাকুরদা মামার বাড়ীর অর্থাৎ সূতী গ্রামে ১২ বিঘা জমি বিক্রি করে এই মন্দির এলাকাটি ৭ বিঘা জমি খরিদ করেন রাজার তহশিল দারদের কাছ থেকে। মন্দিরের পাশে যে বট গাছটি এখনও আছে স্বর্গীয় গজানন মহালদার (দাস) এখানের গাছ দুটি লাগান একটি বট (বর) গাছ ও অন্যটি অসথ্ব (পিপুল) কন্যা গাছ। হিন্দু ধর্মের রীতি অনুযায়ী একজন ব্রাহ্মন পুরোহিতকে দিয়ে ঢোল বাজনা অনুষ্ঠান সরকারে দুটি গাছের বিয়ের ব্যবস্থা করেন আর গাছের তলায় যে টীনের ঘরটি দেবরাজ ইন্দ্রের দুটি পালোয়ান সহ দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা হয়ে থাকে। জমিটির খনন বা সমতল করবার সময় প্রায় ২ ফিট লম্বা ৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮ ইঞ্চি মোটা আকারের বহু পুরাতন (বিগত ২০০ বছর) কালো পাথরটি পাওয়া যায়। এই কালো পাথর পাওয়ার পরের দিন রাত্রে গজানন দাস স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন এটি দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার পাথর। বাংলা ১৩২৫ সাল নাগাদ থেকে আরম্ভ

করে আজ অবধি এই পাথরটি আমরা বংশ পরম-পরায় যথাশক্তি পূজা-আর্চা করে আসছি। ১৯৭০ সালের আগেও এলাকাটি ছিল খুব জঙ্গলাকীর্ণ এবং জলাশয় আমার দাদুকে আমরা এখানে ধান চাষ করতে দেখেছি। মন্দিরটি স্থাপনের আগে এখানে যে টীনের দো চালা ঘরটি বর্তমান আছে সেখানেই বহুদিন প্রায় ১৫ বছর ধরে চলেছিল চাঁচলের একমাত্র লাইসেন্সী তাড়ির দোকানটি। ১৯৮০ সাল নাগাদ তিনি এই লাইসেন্সটি রায় পাড়ার জগদীশ রায়ের নামে স্থানান্তরিত করেন। মন্দির লাগোয়া ৭ বিঘা জমিতেই বর্তমানে গড়ে উঠেছে গজানন কলোনী নামে জনবসতি। ১৩৭৪ সালে মন্দিরটি তৈরী হওয়ায় ২৫ বছর পর মন্দিরটির গায়ে ফাটল দেখা দিলে ২০০৪ সালে মন্দিরের চুরাটি ভেঙ্গে ফেলে নতুন ভাবে নির্মান কার্য করেন লেখক স্বয়ং (মেঘনাদ দাস ও কামাক্ষাচরন দাস দুই সহোদোর ভাই মিলে) মন্দিরটির আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়। মন্দির গৃহে একটি পাথরের শিবলিঙ্গ আছে ও সাদা পাথরের একটি ছোট্ট গো-মাতা রয়েছে। মন্দির গৃহটি ও চারিদিকের বারান্দায় সাদা মার্বেল পাথর বসানো রয়েছে আর মন্দির গাত্রের ভিতরে ও বাহিরে সুন্দর রঙিন ফুল আঁকা টাইলস বসানো রয়েছে। স্বর্গীয় গজানন দাসের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র (যিনি দেবগনে জন্মেছিলেন- এই বংশে আর কোন সন্তান দেবগন পায়নি বাবা মাতুলালয়ে সূতী গ্রামে স্বর্গীয় গয়ানাথ সরকারের বাসায় জন্মেছিলেন ১৯২৪ সালে) শ্রী যুক্ত বিনোদ বিহারী দাস পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে মন্দিরটি নির্মান করেন এবং ১৫ শতক জমি শিব ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করে গেছেন এবং মন্দিরের ও ঠাকুরের সেবাইত হিসাবে ধর্মপত্নী ললিতা দেবী (আমার মাতা) ও দুই পুত্রকে নিযুক্ত করে গেছেন দুটি পৃথক দলিলে। আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব ১৯৪০ সালে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রথম জীবনে মিলিটারী সার্ভিস ছেড়ে দক্ষিণ শহর গ্রামে মাসিক ৩০ (ত্রিশ) টাকা বেতনে প্রাইমারী স্কুল এবং শেষ জীবনে প্রায় ৪০ বছর চাঁচল সাব রেজিষ্টারী অফিসে দলিল লেখকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি খুব শিব ভক্ত ছিলেন সারাজীবনে ৪১ বার বৈদ্যনাথ ধাম দর্শন করেন এবং শিবঠাকুরের ওপর তাঁহার অগাধ ধর্ম বিশ্বাস ছিল। প্রথম জীবনে তিনি শৈব হলেও শেষ

জীবনে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। আমার জন্মদাতা পিতৃদেব এবং আমার ধর্মীয় শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুর ঋন আমি কোন ও দিন পরিশোধ করতে পারবো না। আমরা তার নির্মিত মন্দির "গজানন শিবালয়" টি রক্ষনা বেক্ষনের যথাশক্তি পূজা অর্চনা করবার ক্ষুদ্র প্রয়াস করে চলেছি মাত্র। এই বটগাছ তলায় যে কালো পাথরটি রয়েছে এটিকে পাড়ায় সবলোক ইন্দ্রদেব মহারাজ নামে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করেন এবং প্রতি সোমবার মন্দিরে বেশ ভালই ভক্ত সমাগম হয়। প্রতি বছর শিবরাত্রিতে ধূমধাম সহকারে শিবরাত্রিতে শিবপূজা হয়ে থাকে। বহুদিন পূর্বে বট্গাছের তলায় মন্দিরে (দেবস্থানে) রাখা কালো পাথরটিকে একজন চোর মহিষের গাড়িতে তুলে চুরী করে নিয়ে যাবে বলে রওয়ানা হয় কিন্তু ঠাকুরের মহিমায় পুকুরের কোনে এসেই গাড়িটি ভেঙ্গে বসে যায়। তখন চোরেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। পরের দিন সকালে দাদু পাথরটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সেই কালো পাথরটি টিনের দেবস্থানে রাখা আছে।

আমার ব্যক্তিঋণ

গজানন পল্লীবাসী সকলে
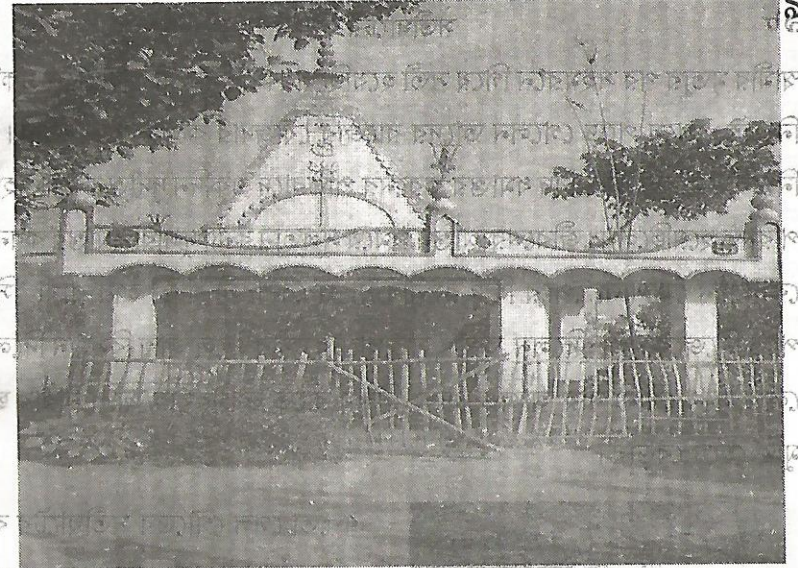
সতীঘাট শ্মাশানানের শিব মন্দির, পাহারপুর।

সতীঘাটের কথা

সতীঘাট নাম করনের পেছনে একটা অতীত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। কত করুন আর্তনাদ আর চোখের জলে ভিজে আছে সতীঘাটের মাটি। সতীঘাটের চিতায় জ্বলে পুরে ছাই হয়ে গেছে কত নারী কিন্তু একটি ঘটনার সাক্ষী এই সতীঘাট কে চিরস্মরনীয় করে রেখেছে। তাজ খাঁ করবানির মৃত্যুর পর সোলেমান করবানি গৌড় বাংলার মসনদে বসেছিলেন। পুরাতন গৌড়কে তার রাজধানী হিসাবে মেনে নিতে না পারলে গঙ্গা নদীর প্রাচীন খাতের অপর পারে তাঁড়া/টাঁড়ায় তার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজনে সেখানকার জনপদ ধ্বংস করে গড়ে উঠল সুলতানের নতুন প্রাসাদ "আগা মঞ্জিল" এবং সেখান কার হিন্দুরা তার উত্তরপূর্ব কোনে গড়ে তুললেন তাদের নতুন বসতি তার নাম হল 'কৃষ্ণপুর'। এই সুলতানের ছোট্ট পরিবারে ছিল বেগম জাকিয়া, দুই পুত্র বায়োজিদ ও দায়ূদ এবং কন্যা দুলারী। প্রাসাদের ছাদ থেকে দেখা যেত 'সতীঘাটের জ্বলন্ত চিতা' । এই চিতার আগুন আর ধোঁয়া সুলতান কন্যা দুলারীর মনে বিশ্বাস এনে দেয় যে পতি প্রেমই হিন্দু রমনীদের সহমরনে প্রেরনা জোগায়। সুলতান কন্যা দুলারী তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিল তার পতিব্রতা হিন্দু রমনীর কথা যিনি

স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরনে গিয়ে সতী হয়েছিলেন। এই দুলারী কালক্রমে একদিন নিজেই প্রেমে পড়ে গেলেন তাদের রাজ্যের ফৌজদার কালাচাঁদ ভাদুড়ীর। এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মন কালাচাঁদ ধর্মান্তর করনের প্রতিবাদে একদিন দুর্দান্ত কালাপাহাড়ে পরিনত হয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম সময়ে সুলতান কন্যা দুলারী ধর্মান্তর করনকে কোন দিন মেনে না পেরে হিন্দু রমনীর সাজে বেনারসী শাড়ী আর শাখা সিঁদুর পড়ে নিজেকে বলী দিলেন অর্থাৎ সতীঘাটের নদীর জলে আত্ম বিসর্জন দিলেন। লোক মুখে শোনা যায় আজও নাকি নিঝুম রাতে ভাগিরথীর জলে নারীর ছায়া মুর্ত্তি হেটে বেড়ায়।

সতীঘাট শ্মাশানানের বর্তমান চুল্লি

এ-তো গেল গৌড়ের সতীঘাটের কথা কিন্তু চাঁচল থানা অঞ্চলে ও মরা মহানন্দার তীরে পাহাড় পুর মৌজা ১৫০ পাহাড়পুর চন্ডি মন্ডপের সোজা পশ্চিম পাশের ছবিতে মন্দিরের পাশেই আছে 'সতীঘাট শ্মশান' যা দূর্গাঘাট নামে পরিচিত। জমিদার ঈশ্বর চন্দ্র বা তারও পূর্বে রামচন্দ্র রায় চৌধূরী মহাশয়ের আমলে হিন্দু হোষ্টেল এলাকায় যে পুরাতন রাজবাটি ছিল সেখানে এক রাজ কুলবধূ আত্মবিসর্জন করে সতী হয়েছিলেন। মহানন্দা নদী পথে সেই সতীর দেহ নাকি দুর্গাঘাটে ভেসে ওঠে। তখন রাজবাড়ীর লোকজন গিয়ে সেই সতীর দেহকে ঐ শ্বশানে দাহ করেন। তখন থেকেই এই নদিঘাট টির নাম লোক মুখে সতীঘাট নামে খ্যাত হতে থাকে। আবার কেও বলেন রাজ পরিবারের জনৈকা সতীর দেহ এই দূর্গাঘাট শ্মশানে দাহ করা হয় বলে এটি 'সতীঘাট/সতীঘাটা নামে পরিচিত হয়েছে। পাহাড়পুরের কিছু উদ্যোগী মানুষের সহযোগিতায় এখানকার শ্মশানের শিবমন্দিরটির নির্মান কার্য্য করেন। এবং একটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। চাঁচলের স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী ১৯১২-২০ সাল নাগাদ ভাঙ্গা রাজ বাড়ীতে অর্থাৎ হোষ্টেলে থাকতেন। (তথ্য

সূত্র-শিবরাম রচনাবলী) হোষ্টেলে থাকা কালীন শিবরাম একদিন বৈকালে তার বন্ধুদের সাথে কুকুর দিঘির পাশ দিয়ে মহানন্দা নদীর ধার দিয়ে সতীঘাট শ্মশানে বেড়াতে আসেন। তাহারা এসে দেখেন যে সতীঘাট শ্মশানে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। কিশোর শিবরাম রাত্রে হোষ্টেলে ফিরে এসে বন্ধুদের সাথে বাজি ধরেন যে রাত্রে একা এসে মরাটির ডান হাতে একটি লাল ফিতে বেঁধে যাবে তাহলে তাহাকে বানিজ্যার দোকানের একহাড়ি রসগোল্লা খাওয়াবে। শিবরামের "অদ্বিতীয় পুরস্কার"-গল্পটি এই সতীঘাট প্রসঙ্গে লেখেছেন।

তথ্যপঞ্জী

☆ মালদার ইতিহাস চর্চা- অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম (গৌড় কলেজ)

☆ জেলার মালদহ ইতিহাস ও জেলা সমগ্র - আব্দুস সামাদ

☆ শিবরাম রচনাবলী - শিবরাম চক্রবর্তী

☆ ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর- শিবরাম চক্রবর্তী

পাহাড়পুর চন্ডীমন্ডপের মন্দির

পাহাড়পুর চন্ডীমন্ডপের কথা

রাজা শরৎচন্দ্রের পিতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং তাহার পিতা রামচন্দ্র রায় চৌধূরী হিন্দু হোষ্টেল বা রানীদিঘি সংলগ্ন এলাকায় পুরাতন রাজ বাটিতে থাকাকালীন ১৪৯ নং পাহাড়পুর মৌজায় পাহাড়পুরে অবস্থিত বেশ বড় বারান্দা সহ বিশাল ঘর পূর্ব দিকে উত্তর দক্ষিণ লম্বা দুই পাশে দুটি ঘর এবং মাথার (ছাদের) ওপর তিনটি চুড়া বিশেষ। এটি মুলতঃ মন্দির হলেও আসলে চন্ডিমন্ডপ নামে এলাকার লোকের কাছে খ্যাত। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে এটি রাজ বাড়ীর পূজো নামেই খ্যাত ছিল। এলাকার রাজাবাবু সতীঘাট শ্মশানে রাজ বংশের জনৈকা সতীর দাহ স্মৃতি সারকে সতীঘাট শ্মশানে স্বপ্নাদেশে একটি চন্ডিমূর্তি বা চন্ডিঠাকুরের অষ্টধাতুর বিগ্রহ পেয়ে এই চন্ডি মন্ডপ স্থাপিত করেন। এই বিগ্রহটি বর্তমানে সেই প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময়ে মাটির চন্ডি প্রতিমা তৈরী করে নিয়মিত পূজা অর্চনা হয়। আগে সপ্তমীর দিন সকালে চাঁচল ঠাকুর বাড়ী থেকে ঢাক-ঢোল সানাই বাজিয়ে রুপা-চাদির নির্মিত ছত্রছায়ায় রাজবাড়ীর হাতী

গুলোকে শোভা যাত্রা সহকারে এই চন্ডিমন্ডপে আনা হোত। পূজা শেষ হয়ে গেলে দশমীর দিন পুনরায় এই বিগ্রহটিকে আবার শোভা যাত্রা সহকারে ঠাকুর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হোত। এটি চাঁচল ষ্টেট ট্রাষ্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। লোকমুখে শোনা যায় চন্ডিমন্ডপে এক সময় মহিষ ও প্রচুর পাঠা বলি হোত। এক সময় নাকি এত পাঠাবলি হোত যে লাল রক্তের বন্যা বয়ে যেত। ড্রেন বা সরু নালা পথে এই রক্ত পাশের পুকুরে গিয়ে পড়ত আর পুকুরের জল লাল হয়ে যেত। দোল পূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সিহিপুর থেকে চাঁচর/বহ্ণুৎসব এর এক বনাঢ্য শোভাযাত্রা করে ঢাক-ঢোল সহ রাজবাড়ীর হাতি গুলোকে নিয়ে পাহাড়পুর চন্ডিমন্ডপের 'চন্ডি দেবীর' পূজাই ছিল রাজবাড়ীর দুর্গা পূজা। পরবর্তী কালে ১৯০৫ সাল থেকে চাঁচল বাজারের বারোয়ারী দূর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। পাহাড় পুর চন্ডিমন্ডপের পূজাটি চাঁচল রাজ এষ্টেটের ট্রাষ্টি কর্তৃক পরিচালিত হলে বর্তমানে এই পূজা পাহাড়পুর গিলাবাড়ীর মানুষের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় একটি পূজা পরিচালন কমিটির মাধ্যমে সুন্দর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মহা অষ্টমী পূজার দিন এখন ও চাঁচল সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির বহু দর্শণার্থি উপবাস থেকে ভোগ ফলমূলের ডালা নিয়ে অঞ্জলী দেওয়ার জন্য চন্ডীমন্ডপে ভিড় জমায়। এটি পাহাড়পুরের প্রতিটি মানুষের কাছে জাতীয় উৎসবে পরিনত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে চন্ডি পূজাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যেবেলা ছোট্ট মেলা হয়ে থাকে। প্রতি বছর মন্ডপের সামনে রাসপূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের মহারাস উৎসবকে কেন্দ্র করে কাঠের তৈরী চরকীতে (ছোট ছোট মাটির পুতুল দিয়ে সাজানো থাকে)। এই রাস পূর্ণিমার দিন বৈকাল থেকে চন্ডিমন্ডপের সামনের মাঠে মেলা বসে। চাঁচল সহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলো থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এই মেলাতে কারন চাঁচল থানা অঞ্চলে আর কোথাও রাসের মেলা হয় না। পুকুরের পশ্চিম দিকে তৈরী হয়েছে হরিবাসর কমিটির একটি পাকা আসর, পাহাড়পুরের গ্রামবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায় প্রতি বছর বৈশাখ মাসে এই আসরে বসে হরিনাম সংকীর্ত্তনের আসর। এখানে দুইদিন ব্যাপী (১৬ প্রহর) কীর্ত্তনের আসরটি বেশ কিছু দিন যাবৎ হয়ে আসছে। আমার মাতামহ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র

দাস মহাশয়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছিলাম তার যতটুকু স্মৃতি গোচরে ছিল ততটাই করেছি। মন্ডপের সন্নিকটেই রয়েছে এলাকার স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক রসরাজ রসসাহিত্যিক কবি শিবরাম চক্রবর্তীর পিতৃদেব শিবপ্রসাদ বাবুর ভাইয়ের বংশ ধর গন। এই বংশের প্রবীন সদস্যশ্রী শিবকিঙ্কর চক্রবর্তী (চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য) মহাশয়ের মুখ থেকে বহু কথা শুনেছি শিবরাম এবং চন্ডিমন্ডপের পূজা সম্পর্কে।

তথ্যপঞ্জী

☆ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা - অশোক মিত্র

☆ জেলা মালদহের ইতিহাস ও জেলা সমগ্র- আব্দুস সামাদ

☆ ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা- শিবরাম চক্রবর্তী

ব্যাক্তিঋণ ঃ শিব কিঙ্কর চক্রবর্তী, সুব্রত পান্ডে (বন্ধুবর), অচিন্ত কুমার মিশ্র, নরেশচন্দ্র দাস (গিলাবাড়ী), বাচ্চু সরকার

জিন্দা পীরের সমাধি, কলিগ্রাম।

ফতেখাঁর সমাধি, গৌড়।

জিন্দা পীর সাহেবের কথা

কলিগ্রাম নামটি এলাকার তথা মালদা জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম নামে পরিচিত হয়ে আছে। পূর্বে খরবা অধূনা চাঁচল থানার অর্ন্তগত কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা ১৫১ কলিগ্রাম এবং মৌজা বগচরা ১৫৩ নং মধ্যে খুব জনবসতি পূর্ণ প্রাচীন এলাকা। ডেলি বাজারের পাশে কলিগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান দরজার সামনে সমতল রাস্তা থেকে প্রায় ৪ ফিট উচুতে জিন্দাপীরের সমাধীস্থলটি

অবস্থিত। এই জিন্দাপীরের পূর্ব পুরুষ ছিলেন কলিমুদ্দিন খাঁ ওরফে কলি খাঁ। সম্ভবত এই কলি খাঁর নাম থেকে কলিগাঁ/ Kaligaon/Kaliga বা কলিগ্রাম নামটি হয়েছে। এই পীরসাহেবের প্রকৃত নাম ছিল সজ্জু খাঁ বা সূর্য্য খাঁ বা সূরজ খাঁ যিনি এক সময় আল্লাহর দরবারে সাধনা লাভ করে পীরত্ব লাভ করেন অর্থাৎ কিছু অলৌকিক জ্ঞানের ভান্ডার (শক্তি) Extra Ordinary Power এর অধিকারী হয়েছিলেন। এই জিন্দাপীরের নাম সূদুর বিহার, মালদা ও দিনাজপুর পর্যন্ত জনমানসে অলৌলিকতার গুনে আকৃষ্ঠ করে রেখেছেন। হিন্দু মুসলমান গ্রামবাসী আজও এই পীরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। এই জিন্দাপীর সাহেবের নামকরনের পেছনে যুক্তি হিসাবে বলা যায় যে তিনি পূর্ব পরিকল্পনা মতো ছয় মাসের খাওয়ার নিয়ে একটি গর্ত্ত করে প্রবেশ করেন এবং পরবর্তী কালে এখানেই সুন্দর ভাবে নির্মান করা হয় জিন্দাপীরের দরগা। এই দরগার প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোনও লিপি নেই মনে হয় বাঁশের দোচালা রীতি অনুযায়ী তৈরী এই সমাধি ভবনটির বাহিরের মাফ প্রায় ২০ ফিট লম্বা এবং ১৪ ফিট চওড়া। দেওয়ালের ভেতরের মাপ ১৮ ফিট লম্বা এবং ১২ ফিট চওড়া প্রায় চার পাশে উচু বারান্দা আছে। দরগাটির পূর্ব দিকে একটি মাত্র দরজা পরিমাপ ৪ফিট ১০ ইঞ্চি উচু এবং ৩ ফিট ৪ ইঞ্চিভবনটির মাথার উপরে চুন-সুরকি দিয়ে তৈরী একটি প্রস্ফুটিত পদ্মকোরক এই কক্ষটির মাঝখানে পীরের (সজ্জু খাঁর) সমাধি সবুজ মসলিন চাদর দিয়ে ঢাকা থাকে। আর উপরে মসারী খাটানো থাকে। পাশেই বেশ কয়েকটি ছোট ছোট সমাধি আছে। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় এই সমাধিগুলি খাদেমদের বলে পরিচিত হয়ে আছে। পীরের দরগাটির মাঝখানে উচু এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ঢালু চাদরে মোরা দেখে মনে হয় বাঁশের দোচালা গৃহ কিন্তু চাদরটি চুন সুরকি দ্বারা জমানো আছে। প্রতিবছর মহরমের দিনে হিন্দু মুসলমান বহু ভক্ত সমাগম হয়ে মেলার আকার নেয় যা জিন্দাপীরের মেলা নামে খ্যাত। মহরমের পরের দিন বা দশমির পরের অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় বাসি কারবালায় চাঁচল থেকে কয়েক হাজার লোক তাজিয়া সহ মহরমের সাজে অর্থাৎ ঢোল ও বোম্ (মহরমের সময় ব্যবহৃত বড় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) বাজাতে বাজাতে এক সাথে

হাসেন ও হুসেনের নাম জপ্ করতে করতে জীন্দাপীরের দরগায় মিলন হতে যায়। অর্থাৎ চাঁচলের পীর সাহেবের নিকট মিলন হওয়ার পর চাঁচল ঠাকুর বাড়ি এবং কলিগ্রাম জিন্দাপীরের মাঝারে (দরগায়) মহরমের দল নিয়ে মিলনের এই রীতি দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। লোক মুখে শোনা যায় যে কলি খাঁর ছোট ভাই ছিলেন চাঁচলের পীর আখি সিরাজ-সেই জন্যই এই মিলন পর্ব।

এলাকার হিন্দু মুসলমান মানুষের নিকট এই জিন্দাপীর (সজ্জু খাঁ) যে কারনে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে সেটি হল পূর্ব বঙ্গের জনৈক ব্রাহ্মন কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি বৈদ্যনাথ ধামে নিজের উতকট ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে গেছিলেন। সেখানেই স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন যে মালদা জেলার কলিগ্রামের এই পীর সাহেবের পাদোদক বা পা ধোয়া জল (পাণি) চরনামৃত রূপে পান করলে তিনি এই ব্যাধি থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করবেন। কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত লোকটি তখন বহু খোজখবর করে কলিগ্রামে এসে হাজির হয়েছিলেন। তিনি সরাসরি জিন্দাপীরের পাদোদক চাইলে পীর সাহেব তাহা দিতে অ-সম্মতি জানান। এরকম নিরাসাগ্রস্ত হয়ে কুষ্ঠ রোগীটি পীর সাহেবের বাবুর্চির সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে তাহাকে রাজি করান পীর সাহেবের পাদোদক পাওয়ার জন্য। পীর সাহেব যে কূয়োর জলে স্নান করতেন সেই জল নালা পথে বাড়ীর অপর প্রান্তে একটি গর্তে গিয়ে পড়তো। প্রতিদিন পীর সাহেবের বাবুর্চি গোপনে কুষ্ঠ রোগীটিকে স্নানের সময় বলে দিতেন আর বাড়ীর অপর প্রান্তে কূয়োর জলের নালা পথের স্থান বা পাদোদক জল চরনামৃত মনে করে সেই কুষ্ঠরোগ গ্রস্থ ব্রাহ্মন এইভাবে প্রায় ছয় মাস কাল জল পান করেন এবং আস্তে আস্তে তাহার শরীরের সকল ক্ষত জায়গা গুলো ভালো হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। অসুস্থ কুষ্ঠরোগী সেই ব্রাহ্মন সুস্থ হওয়ার পর পীর সাহেব কে পুরো ঘটনা খুলে বলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ঘটনার পর সেই কুষ্ঠ রোগী নিজ দেশে চলে গেলেন এবং পীর সজ্জু খাঁ তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা বলে কাঠ ও লোহা দ্বারা নির্মিত একটি বৃহৎ খিলানের সমাধিগৃহ নির্মান করে এবং একটি গর্ত তৈরী করে ছয় মাসের খাওয়ার সঙ্গে নিয়ে জীবিত অবস্থায় সমাধিস্থ হয়ে যান। তিনি জীবিতাবস্থায় সমহিত হয়েছেন বলে জিন্দাপীরের

সমাধি বলা হয়ে থাকে। বেশ কিছুদিন পর পীর সাহেবের সমাহিত জায়গায় এই সমাধি সৌধটি নির্মান করা হয়েছে। দো-চালা ছাদ বিশিষ্ঠ এই সমাধি সৌধটির নির্মান কৌশলের পরিকাঠামোটি বাঁশের রীতি Bamboo Style নির্মিত দেখে মনে হয় গীড়ের ফতেখাঁর সমাধি ভবনের মতো অনেকটা উপরের ছবিটি কলিগ্রামের জীন্দাপীরের সমাধী গৃহএবং নিচের ছবিটি হল গৌড়ে অবস্থিত ফতেখার সমাধি।

জনশ্রুতি থেকে জিন্দা পীর সাহেবের কথাজানা যায় একদিন ৪/৫ জন লোক শীত কালে ঘোড়া গাড়িতে করে ভ্রমন করেছিলেন। সেই ঘোড়া গাড়িতে স্বয়ং পীরসাহেব ও সওয়ারী (একজন যাত্রী) হিসাবে ছিলেন। যাত্রীরা হঠাৎ লক্ষ করেন যে পীর সাহেব খুব ঘেমে গেছেন। তাঁর সারা গা থেকে ঘাম ঝরছে ঘামে জামাকাপড় সব ভিজে গেল । শীতকালে হঠাৎ এই ঘেমে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে উত্তরে পীর সাহেব জানালেন যে তিনি কাঁদায় আটকে যাওয়া একটি গরুর গাড়িকে তুলে দেওয়ার জন্য গেছিলেন। বিপদগ্রস্থ গরুর গাড়ির চালক নাকি পীর সাহেবকে স্মরণ করেছিলেন। আর সেই গরুর গাড়ির চালক কে বিপদ থেকে তুলে দেওয়ার জন্যই হঠাৎ তিনি ঘেমে গেছেন। এভাবে বহু ছোট ছোট ঘটনার কথা লোক মুখে আজও শোনা যায়। লোক মুখে শোনা যায় পীর সাহেবের দাড়ি কাটতেন এক স্থানীয় নাপিত দীর্ঘ দিন ধরে। মৃত্যুকালে অর্থাৎ পীর সজ্জু খাঁ তাঁহার জীবিতাবস্থায় সমাহিত হইবার সময় সেই নাপিত কাতরে পীর সাহেবের কাছে প্রার্থনা জানালে স্বয়ং পীর সাহেব তাঁহার মস্তক থেকে নিজের পাগরীটি খুলে সেই নাপিতের নিকট (বর্তমান বাদল প্রামানিকের পূর্বপুরুষ) রেখে বলেন তোর কোন দিন বিপদ হলে এই পাগরীকে বললেই আমি জানতে পারবো এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করবো। পীর সজ্জু খাঁর মাথার সেই পাগরী বাদল প্রামানিকের বাড়ীতে সারাবছর থাকে এবং বংশ পরম্পরায় তাহারা পাগরীটিকে ধূপবাতি দেখায়। প্রতিবছর মহরমের দিন গুলোতে দরগা কর্ত্তৃপক্ষ স-যত্নে সেটিকে আনার পর দরগা মধ্যে রাখা হয় এবং পর্ব শেষ হলে আবার সেই নাপিত বাড়ীতে পীর সাহেবের পাগরীটিকে পৌছে দেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত এই সাম্প্রদায়িক

সম্প্রতি খুব কম জায়গায় দেখা যায়। চাঁচলের হিন্দু জন সাধারন পীরসাহেব কে কতটা শ্রদ্ধা ভক্তি করেন শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা পীর আখিঁ সিরাজের দরগায় আসলেই দেখা যায়।

তথ্যপঞ্জী

☆ জেলা মালদহের পীর ফকিরদের কথা- আব্দুস সামাদ

☆ অতীতের মালদহ- প্রবাল রায়

☆ মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা- সুষ্মি সোম

☆ মালদহ জেলার ইতিহাস- প্রদ্যোৎ ঘোষ

মালতীপুর কালীমন্দির

মালতীপুর কালীমন্দিরের কথা

মালতীপুর মৌজা-১২৯ চাঁচল ব্লক বর্তমান ৮১ নং জাতীয় সড়কের ওপরে সমৃদ্ধ শালী গ্রাম। মালতীপুর গ্রামে এক সময় আর্থিক ও ব্যবসা বানিজ্য ভালো হত বলে চাঁচল রাজ এষ্টেটেও বহু প্রমান পাওয়া যায়। ১৮৮৮ সালের এক আর্থিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে চাঁচল রাজ ষ্টেটের অন্য এলাকা থেকে মালতীপুর, সমঝিয়া/সাঞ্জিয়া ও নবগ্রাম মৌজার কৃষি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বেশি ছিল।

In 1888 a detailed economic enquiry was made in village Malatipur, Samjihia and Nabagram of Chanchal Estate in the North of the District. These villages were chosen as representing the mean between the richer lands of the east of the District. It was found that for Agricultural labours the average wage per day 2 Annas for men and for boys one anna with two (2) meals of the value of copies and 6 pies, respectively, while for harvesting one -six of the grain was given to the reaper- Malda District Gazeteer by G.E. Lambourn page - 68 (1918)

এটি একসময় টাকীর জমিদারীর গৌড়সন্ড/গৌড়হন্ড পরগনার অর্ন্তগত ছিল কেও বলে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব শোধ দিতে না পারলে পরের দিন তার জমিদারী নীলামে উঠে যেত এবং এইভাবেই জমিদার ঈশ্বর চন্দ্র রায় চৌধূরীর পিতা রাম চন্দ্র রায় চৌধূরী নগদ ৯,১০০ পাউন্ডে গৌড়হন্ড/গৌড়সন্ড পরগনাটি খরিদ করেন। তখন গৌড়হন্ড/গৌড়সন্ড পরগনাটির আয়তন ছিল ২৪,৯১৬ একর বা ৩৮.৯৩ বর্গ মাইল এলাকা বিস্তৃত। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (তথ্য- The Statistical Account of Bengal -1876, Page 133-134, By W.W. Hunter) চাঁচল ষ্টেটের রাজ পরিবার বা জমিদারীর সুষ্ঠু পরিচালনায় জমিদারী চলতে থাকে। ১৮৪৮ সাল থেকে হাতিন্ডা এবং গৌড়হন্ড/গৌরসন্ড পরগনা দুটি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে চাঁচল রাজ এষ্টেটের নাম বরাবর ইংরেজ বাহাদুরের সেরেস্তায় নাম নথিভুক্ত হয়।

এলাকার বিখ্যাত মা-কালীর অষ্টধাতুর মূর্ত্তিটির রাজা বাবুরা চাঁচলে স্থাপন করবেন বলে কাশী থেকে আনয়ন করেন। সামসী থেকে মূর্ত্তিটিকে জল পথে নৌকায় (মহানন্দা নদী পথে যেটি এখন মরা মহানন্দা বা বারমাসিয়া নদী নামে পরিচিত) নিয়ে আসার সময় মালতীপুরের কাছাকাছি এলে নৌকাটি থেমে যায় এবং সেই রাত্রে মাঝিরা সেখানেই থেকে যায়। বিভিন্ন জনশ্রুতি থেকে যানা যায় যে নৌকার মাঝি ভাইরা নৌকাটিকে অনেক কষ্ট পরিশ্রম করেও আর নড়াতে পারেননি। আবার কেউ বলেন যে সেই রাত্রেই রাজাবাবু স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন যে মা কালীকে মালতীপুরেই স্থাপন করতে হবে। এই নির্দেশ পেয়ে রাজাবাবুর কথা মত বর্তমান জায়গাটিতে কালীমার অষ্টধাতুর প্রতিমাটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। একসময় রাজপরিবারের লোকেরা চাঁচল থেকে গিয়ে খুব ধুম ধাম সহকারে এই পূজা হত। এই কালী পূজাটি প্রায় ২০০ বছর প্রাচীন। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার এখানে দুর-দুরান্তের বহু ভক্ত সমাগম হয়। প্রতি বছর দেওয়ালিতে সারারাত্রি ধরে পূজা অর্চনা চলে এবং প্রসাদ বিতরন হয়ে থাকে। আগের পুরানো মন্দিরটিকে ভেঙ্গে গত ১৯৮৭ সালে বর্তমান মন্দির গৃন নির্মান করা হয়েছে। এই

পূজাটি এখনও চাঁচল রাজ ষ্টেটের ট্রাষ্টী বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে দীপাবলীর দিন রাত্রে প্রায় ২/৩ হাজার ভক্ত সমাগম হয় এবং পাশের হাটের জায়গাটিতে মেলাও বসে থাকে। এই কালী পূজোটি এলাকার প্রাচীন পূজা হিসাবে চাঁচল বাসীর কাছে চিরস্মরনীয় হয়ে আছে। এই মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত তপন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকেও একই রকমের তথ্য জানা যায়।

তথ্যপঞ্জী

☆ জেলা মালদহের ইতিহাস ও জেলা সমগ্র - আব্দুস সামাদ।

☆ মালদহ জেলার ইতিহাসচর্চা - অধাপিকা সুষ্মিতা সোম।

☆ Malda District Gazeteer - G.E. Lambourn

☆ The Statistical Account of Bengal- W.W. Hunter

আমার ব্যক্তিঋণ

১) দ্বিজেন্দ্র নাথ দাস - (ব্যবসায়ী মালতিপুর)

২) পরিতোষ কুমার সরকার - (প্রাক্তন শিক্ষক-মালতিপুর)

৩) তপন ভট্টাচার্য- পুরোহিত (মালতিপুর কালীমন্দির)

৪) প্রভাষ কর্মকার - (ব্যবসায়ী মালতিপুর)
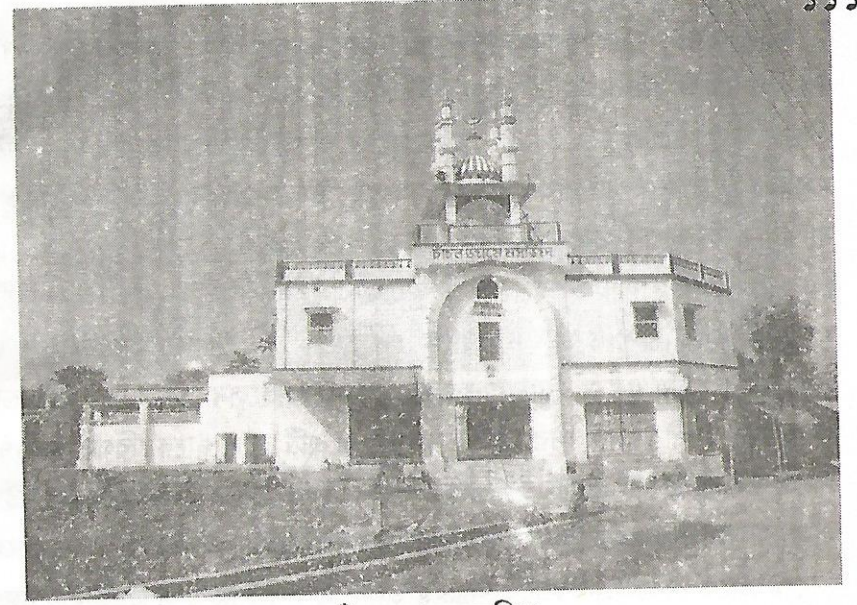
চাঁচল জামে মসজিদ

চাঁচল জামে মসজিদ-এর কথা

এটি চাঁচলের খেলেনপুর মৌজা -৬৭- দক্ষিণে চাঁচল মৌজার -৭০ এবং খেলেনপুরের পীর সাহেবের (পীর আঁখি সৈয়দ আখেরী শাহ/পীর আখি সৈয়দ আখেরী জালালুদ্দিন সাহেব) দরগার সমাধি স্মৃতি সৌধটির উল্টোটিকে এবং নয়াদিঘির উত্তর পাড়ে চাঁচল (৭০) দাগ নং ৬৪১ পরিমান প্রায় ৩০ (ত্রিশ) শতক মাটির ওপর অবস্থিত। বর্তমানে প্রায় ৬ (ছয়) বিঘা পরিমিত চাঁচল রাজার নয় দিঘিটি পরবর্তী রায়ত বিশ্বনাথ মুখার্জীর কাছ থেকে চাঁচল জামে মসজিদের নাম বরাবর খরিদ করা হয়েছে। এই পুকুরটির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাড়ে জনবসতি ও দোকান পাশার গড়ে উঠেছে কেবল জল টুকুই জামে মসজিদ কমিটি ব্যবহার/মাছ চাষ করে এবং দুটি সিড়ি বাধানো ঘাটে জনগণ স্নান করা ও কাপড়/চোপড় কাঁচে। একসময় বুধবাড়ী হাট ছিল, তখন হাটের বহু গরু মহিষও স্নানাদি করতো এই পুকুরে। চাঁচল জামে মসজিদের বর্তমান সম্পাদক আব্দুস সাত্তার (খেলন পুরের শিক্ষানুরাগী-উৎসাহী যুবক) সভাপতি মাননীয় ঘেসরুদ্দিন আহমেদ সাহেব (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সন্তোষপুর কাতলামারী হাই মাদ্রাসা)

সিহিপুর এবং কোষাধ্যক্ষ নেজামুদ্দিন আহমেদ (ব্যবসায়ী নজরুল পল্লী -চাঁচল) চাঁচল জামে মসজিদ কমিটির পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে যা জানালেন আমি তাদের কাছে চীর কৃতজ্ঞ ও ঋণী তাদের মুখের কথাই লিপিবদ্ধ করেছি মাত্র। এই মসজিদ টিতে কয়েকটি পায়খানা, বাথরুম এবং উজু করবার সু-ব্যবস্থাও রয়েছে। যা হোক রাজাবাবু মহানন্দার ওপারে চলে গেলে ৬৪৫/১১১৮ দাগে ৭১ (একাত্তর) শতক মাটি চাঁচল রাজ হিন্দু ছাত্রাবাস, ৭১১ দাগে ৫৩ শতক মাটি মুসলমান ছাত্রা বাস এবং ৬৪১ দাগে ৩০ শতক জমি সম্ভবত মুসলমান জন সাধারনের ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করবার জন্য দিয়েছিলেন অথবা এটি হাতিন্ডা পরগনা স্থিত পীর আখি সিরাজের ভূসম্পত্তি ও এটি হতে পারে। বিগত ১৯৭৭ সালে এখানে একটি বিরাট জলসা হয় এবং এরপর থেকেই এলাকার উৎসাহী মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় মসজিদটি গড়ে উঠেছে। মসজিদটির সব কাজ ভালো ভাবে পরিচালনা করতে আয়ের উৎস হল পাশের পুকুরটিতে মাছ চাষ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থিক দান। এই আল্লাহর দরবারে বিশাল ঝক্‌ঝকে মেঝেটিতে একসাথে প্রায় ১০০০ লোক এবং ঘরের বাইরে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে ও প্রায় ১০০০ লোক একসাথে নামাজ পড়তে পারে। বিগত ১৯৮৫-৯০ সাল মধ্যে এটির কারুকার্য্য ও নবনির্মানকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদকের মুখে শুনে খুব ভালো লাগলো যে এখানে স্কুল কলেজের কয়েকজন ছাত্র এখানে থেকে লেখাপড়া করে। রাত বেরাতে হঠাৎ বিপদগ্রস্থ মুসাফির দের থাকার জন্য সুব্যবস্থা ও আছে। তাহারা আর ও জানালেন যে আগামী দিনে দো-তালা গৃহটির ছাদ হলে কিছু সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এই জামে মসজিদ-টি সারাক্ষন দেখাশুনা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছেন ইমাম ও মোয়াজ্জেম। এখানে প্রতি শুক্রবার নমাজের দিন নিয়মিত ভাবে ৫০০/৭০০ লোক নমাজ পড়েন।

যাদের একান্ত চেষ্টায় ও অনুপ্রেরনায় চাঁচল জামে মসজিদটি গড়ে উঠেছে তাহারা হলেন ঁআব্দুস সামাদ, ঁফরিদ সরকার, ঁআলাউদ্দিন খান, ঁনুর মহাম্মদ, ঘেসরুদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সাত্তার (খেলনপুর), আব্দুস সাত্তার (নজরুল পল্লী), আনসারুল ইসলাম, আমজাদ আলী, আব্দুস শোভান, জয়নাল আবেদিন, আলাউদ্দীন সরকার খেলেনপুর তথা নজরুলপল্লী তথা চাঁচলের জনগন।
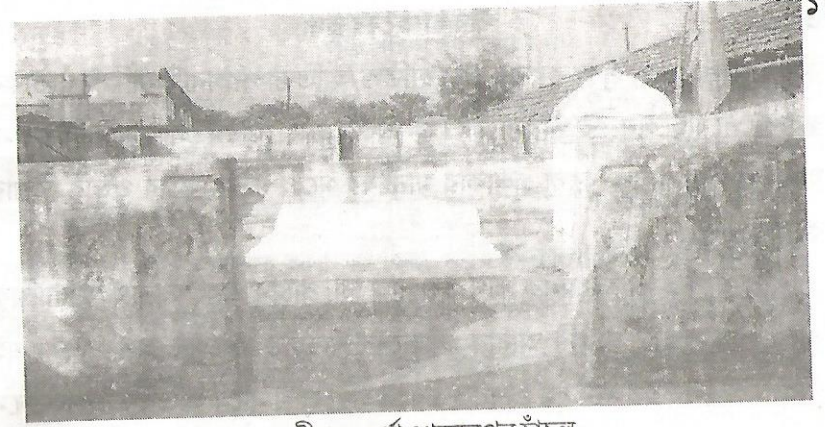
পীরের দর্গা খেলেনপুর চাঁচল

পীর সাহেবের কথা

ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা হজরত মহম্মদের মতাদর্শে সুদূর আরব থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বহু পীর, ফকির ও দরবেশ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এসেছিলেন। চাঁচলের বিখ্যাত পীরসাহেব যাহার প্রকৃত নাম ''পীর আখি সৈয়দ আখেরী শাহ'' বা 'পীর আখেরী সৈয়দ জালালুদ্দিন শাহ' অথবা 'পীর সৈয়দ আখেরী শাহ' -হতে পারে বিভিন্ন পুস্তকে এই ভাবেই নাম পাওয়া যায়। যা হোক এই পীর সাহেবের দরগাটি চাঁচলের খেলনপুরে জামে মসজিদের পাশেই অবস্থিত মৌজা খেলনপুর ৬৭ তে অবস্থান। আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে এই পীর সাহেব ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর বিহারের মণিহারি থেকে চাচর ভূমিতে এসে তার আস্তানা করেন । বিভিন্ন জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে কলিগ্রামের জিন্দাপীর অর্থাৎ কলিখার আপন ভ্রাতা ছিলেন এই পীর আখেরী শাহ। খরোয়া বা খরবা প্রদেশাঞ্চলটির এক কালে চঞ্চর/চাচর ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেন। এই পীর সাহেব। মোঘল যুগে বিহারের মনিহারী অঞ্চল থেকে এসে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই বিখ্যাত পীর সাহেবের নাম স্বারক থেকে মালদার হবিব পুরের আখেরীডাঙ্গা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবান গোলা থানার আখেরীগঞ্জ এলাকা দুটির নাম হয়েছে বলে লোক মুখে শোনা যায়। মোঘল আমলে কোন এক নবাব কন্যাকে

ভীষন অসুখ থেকে সুস্থ্য করবার জন্য হাতিন্ড/হাতিন্ডা পরগনাটি নাকি উপঢৌকন স্বরুপ পেয়েছিলেন এই পীরসাহেব। জনশ্রুতি এবং বিভিন্ন লোক মুখে যা শোনা যায় এই পীরসাহেব খরবা এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

পীর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বৃদ্ধ বা প্রাচীন এবং ভাবার্থ আধ্যাত্মিক গুরু। পীর শব্দটি ফারসী আবার বৌদ্ধদের ব্যবহৃত শব্দের অর্থ 'বুদ্ধ'। এই পীরগন ছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারক এবং ইহারা সূফী নামে অভিহিত। কালক্রমে ইসলামের মত ব্যবহারিক ধর্মেও একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যার প্রধান কাজ হল সংসার ত্যাগী না হলেও এরা সংসার বিরাগী ছিলেন। ইসলাম ধর্মে এই ধরনের লোকেরা সাধারনতঃ পীর, সুফী উপাধি ছাড়াও দরবেশ, ফকির, ওলি বা আউলিয়া নামে অভিহিত। অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল এঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আর পয়গম্বর কথাটির অভিধানিক অর্থ হল ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ। এই Conception টা প্রকৃতপক্ষে ইহুধি-রা ব্যবহার করতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই পয়গম্বর শব্দটি ইসলাম ধর্মেও প্রবেশ করে থাকে।

যা হোক চাঁচলের এই চীর শ্রদ্ধা ভাজন ব্যক্তিটি বৃদ্ধ বয়সে পবিত্র হজ্ব কালে এখানে তাঁর নামাঙ্কিত ভূ-সম্পত্তি হাতিন্ডা পরগনাটি এলাকার জমিদার রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট গচ্ছিত রেখে মক্কা যাত্রা করেন। কথা ছিল পীর সাহেব যদি হজ্ব করে ফিরে আসেন তা হলে তাঁহার ভূ-সম্পত্তি জমি ফেরৎ নিবেন আর ফিরে না এলে এই সম্পত্তি জমিদারের নাম বরাবর হয়ে যাবে। কিন্তু হান্ডি পরগনাটি প্রকৃত পক্ষে চাঁচল রাজ পরিবারের নামে কিভাবে হাত বদল হল তার পরিষ্কার কোন তথ্য খুজে পাওয়া যায়নি।সেই সময় রাস্তাঘাট এত উন্নত ছিল না ফলে মক্কা যাওয়া আসার জন্য প্রায় ৬ মাস কাল সময় অতিবাহিত হত। কালক্রমে কয়েক বছর পর যখন পীর আখেরী সৈয়দ হজ্ব কর্ম সেরে চাচর ভূমিতে ফিরে এলেন তখন রাজা ঈশ্বর পরলোক গমন করেছেন ফলে পীর সাহেব তাঁহার ভূ-সম্পত্তি রাজা শরৎচন্দ্রের কাছে ফেরৎ চাইলেন। কিন্তু রাজা শরৎ চন্দ্র রায় চৌধুরী বাবু নাকি পীর নামাঙ্কিত ভূ-সম্পত্তি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন।

জনশ্রুতি এবং বিভিন্ন লেখকের তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক থেকে যা জানা যায় এমতা বস্তায় পীর সাহেব নাকি রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন যে আমার সম্পত্তি যে বেইমানি করলো তার বংশের কেহ এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না। এ ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমার জানার কথা নয় কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল রাজাবাবুর একমাত্র বংশধর কুমার শিবপদ র অকাল মৃত্যু হয় ফলে মেয়ের বংশধরগন এখানে চাঁচল রাজস্টেটের যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ করছেন। যা-হোক এই পীর আখেরী সাহেব এখানে সমাধিত হয়ে আছেন। তিনি মরে গেলেও চাঁচলের মানুষের মনের গভীরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটা জায়গা করে নিয়েছেন। কেও কোন অবিশ্বাসের বা বেই মানের কাজ করলেই আমরা বেইমানি করিস না এটা পীরের মাটি সইবে না। চাঁচল পীরের মাটি বেইমানি করা এখানে যায় না- এই কথাটা চাঁচলের প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রবাদ বাক্যের রূপ নিয়েছে। জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরা সকালে (হিন্দু মুসলমান জৈন, মারোয়ারী) শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা পীর সাহেবের দরগায় সিন্নি দিতে যাই। বিশেষতঃ চাঁচলের ব্যবসায়ী মহল শুক্রবার সন্ধ্যায় পীরের দরগায় যেতে ভোলেন না। মহরমের সময়ে এখানে লোক জমায়েত হোত একসময়। মহরমের তাজিয়া নিয়ে পাশ্ববর্তী এলাকার প্রায় ১৬/১৭ তাজিয়া এখানে পীরের দরগায় মিলিত হতে আসতেন। ১৫-১৮ ফুট উচু কোবাইয়ার তাজিয়াটি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষন করতো। এখন আর কোবাইয়ার সেই সুন্দর তাজিয়াটি আর এখানে আসতে দেখা যায় না। এখানে পীরের মাঝারের সামনে মহরম উৎসব (পর্ব) কে কেন্দ্র করে ছোট মেলা বসে প্রতি বছর।

<u>তথ্য সূত্র</u>

☆ ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ - সম্পাদনা ইছামুদ্দিন সরকার।

☆ মালদা জেলার ইতিহাস ও জেলা সমগ্র- আব্দুস সামাদ

☆ মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা- অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম (অধ্যাপিকা গৌড় কলেজ)।

চাঁচলের কথ্য ভাষা

সমগ্র চাঁচল থানা, হরিশ্চন্দ্রপুর, দিনাজপুরের কিছু অংশ, বিহারের বারসোই থানার কিছু অংশ সহ ইসলামপুর পর্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় চাঁচলের এই ভাষাটির প্রচলন দেখা যায়। তবে এলাকা বিশেষে এই ভাষার বাচনভঙ্গি এবং কথা বলার টান ভিন্ন-ভিন্ন রকমের রয়েছে। যেমন-চাঁচলিয়া কথ্য ভাষার সঙ্গে কলিগ্রামের কথ্য ভাষার মধ্যে প্রভেদ লক্ষ করা যায়। এই ভাষাকে চাঁচলিয়া কথ্য ভাষা বলা সঠিক হবে না কারণ বিভিন্ন বসতি অঞ্চলের বসতির তারতম্য অনুযায়ী এই আঞ্চলিক ভাষাগুলির বৈশিষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এই আঞ্চলিক ভাষা টিকে বিভিন্ন লেখক লেখিকাগন চাঁচলিয়া কথ্য ভাষা নামে অবিহিত করেছেন। এই থানার পুরাতন অধিবাসী হিন্দুদের মধ্যে এই ভাষা লক্ষ্য করা যায় লক্ষ করা যায়। এলাকার মুসলমান, পাঠান ও শেরশা বাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বাচন ভঙ্গী লক্ষ করা যায়। এই সব এলাকার পুরানো জনজাতিদের মধ্যে তন্তবায় তাতী, মাহিষ্য, জেলে, মালো, কামার, ভুই খালি, কোচ রাজবংশী, সদ্‌গোপ, ঘোয (গোয়ালা) পোদ্দার ও তিওর সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বিভিন্ন জমিদারী সেরেস্তায় কাজের সুবাদে সাওতাল পরগনা, বিহার থেকে বহু লোক খরবা বা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় প্রবেশ করে। যেহেতু এই থানা দুটি দীর্ঘ দিন পূর্ণিয়া জেলায় ছিল সেই জন্য এই আঞ্চলিক ভাষাটির মধ্যে বেশি পরিমানে শব্দ হিন্দি ও আরবী ভাষা থেকে এসেছে। যেমন চুলহা শব্দটি হিন্দী শব্দ ভান্ডার থেকে এসেছে। আগের তুলনায় গ্রাম্য এলাকায় বহুল পরিমানে শিক্ষার আলো গ্রামে গঞ্জে ঢুকে পড়েছে। বৈবাহিক সূত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানুষ ক্রমশ দূরবর্তী জায়গার শিক্ষিতা মেয়ে ঘরে আনলে নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা বা চাঁচলিয়া কথ্য ভাষাটির প্রচলন দিন দিন কমে যাচ্ছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে ছেলে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বেশি করে বাংলা ভাষার ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে যা হোক এই ভাষাটির মধ্যে শ্রুতি মাধূর্য খুব সুন্দর অনেকটা ভোজপুরী ভাষার মতো বলতে পারা না গেলেও বোঝা যায়। এই চাঁচলিয়া কথ্য ভাষাটি বা আঞ্চলিক ভাষাটি কেমন তার একটু নমুনা পেশ

করা যাক। আমরা খুব নিকট আত্মীয় বা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলি তখন কথায় কথায় 'গো' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি সেই রকম চাঁচলিয়া কথ্য ভাষাটির মধ্যে 'গো' না বলে 'গে' শব্দটি খুব বেশি করে ব্যবহার করা হয়।যেমন

(১) মুই নি জামু গে মা- বাংলায় আমি যাবো না গো মা (Mother I Shall not go)

(২) মোর শরীলটা ভাল নি লাগে - আমার শরীর ভালো লাগছে না। (I do not fill well)

(৩) মরা ওনহা নি জামু- আমরা ওখানে যাবো না (We will not go there)

এ তো গেল আঞ্চলিক ভাষার কথা কিন্তু চাঁচল এলাকায় একটি কথ্য ভাষা দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে লোক মুখে। এই ভাষাটি কথ্য ভাষা না সাধু রীতি না চলিত রীতি কোনটাকেই মেনে চলে না। এর যেন একটা নিজস্ব রূপ আছে। যেমন-

উহাকে খাওয়াইয়া দাও (সাধুরীতি)
ওকে খাইয়ে দে (চলিত রীতি)
ওকে খাওয়ায় দে (চাঁচলিয়া কথ্য ভাষা)
শুভকে কাপড় পড়াইয়া দাও (সাধু)
শুভকে কাপড় পড়িয়ে দে (চলিত)
শুভকে কাপড় পড়ায় দে (চাঁচলিয়া কথ্য ভাষা)
রামুকে পাঠাইয়া দাও (সাধু)
রামুকে পাঠিয়ে দাও (চলিত)
রামুকে পাঠায় দে (চাঁচলিয়া কথ্য ভাষা)

ভাষাটি একটি আঞ্চলিকতা বাদ কে ছাড়িয়ে ক্রিয়াপদ টির সাধু ও চলিত রূপের সংমিশ্রনে একটি আলাদা ভাষার রূপ নিয়েছে। এটাই হল চাঁচলের কথ্য ভাষা বা চাঁচলিয়া ভাষা বা চাঁচলিয়া কথ্য ভাষা।

গ্রাম্য এলাকায় বোলবাই (বোলবাহি) গানেও এই ভাষার প্রচলন দেখা যেত

কিন্তু কালের পরিবর্তনে বাংলা ভাষার চল বেশি পরিমানে হওয়ার জন্য পরবর্তী কালে বাংলা ভাষাতে বোলবাহি (বোলবাই) গানের প্রচলন দেখা যায়। এছাড়াও চাঁচল থানা অঞ্চলে যাহারা সুদুর উত্তর প্রদেশ থেকে চাঁচলে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য এসেছেন খারোয়ার/খারোয়া শ্রেণীভুক্ত জনশ্রুতি তাহারা এখানে এসে রাম বা রায় বা গুপ্তা উপাধি ব্যবহার করছেন। এই সব জনজাতির লোকেরা বিহারী ও ব্রজবুলি ভাষার সংমিশ্রনে তৈরী হওয়া ভোজপুরী ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বার্তা বলেন। যেমন সামসী, চাঁচল, নদিসিক ও তুলসীহাট্টায় কিছু পরিবার এখনও বসবাসকারী যাদের আমরা বিহারী মুসলমান বলে জানি তাহারাও ভোজপুরীর মতোই এক প্রকার ভাষায় কথা বলে। চাঁচলের জেলে পাড়ায় ৫/৭ টি পরিবার কর্মকার পদবিধারী লোকেরা রতুয়ার খোট্টা ভাষায় কথা বলে। বিরস্থলী ও কলিগ্রামের পাঠানটুলির পাঠান সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে হিন্দী খোট্টার সংমিশ্রনে তৈরী হওয়া পাঠান ভাষায় কথা বলেন। এলাকার ডোম, - চামার, মুচী, রবিদাস জনজাতি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন। কাজের সুবাদে সাওতাল পরগনা ও ছোট নাগ পুর এলাকা থেকে আগত চাঁচলের দক্ষিণ শহর, বঙ্গপাল, কান্ডারন এলাকায় যে সাওতাল, মুন্ডা, মর্ম্মু, ওরাও মার্ডি জনজাতী সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে সাওতালী ভাষায় কথা বলেন। চাঁচলের (থানা অঞ্চল) প্রায় সর্বত্র তন্তবায় তাতী, গণেশ এবং কলিগ্রামে ১৮০৯-১০ এর জেলা গেজেটীয়ার (বুকানন হ্যামিলটন সূত্রে) এর রিপোর্টে জানা যায় ১৯১৮ সালে ল্যাম বোর্নের রিপোর্টে পাওয়া যায় থানার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম খুব ঘন (ঠাসাঠাসি) করে একসময় তৈরী হয়েছিল ৭০০ পাকা বাড়ি। এখানে তন্তুবায় তাতী, তেলি, মজুমদার, রায় চৌধূরী, সরকার, রায়, মন্ডল, চংদার, প্রামানিক, বিশ্বাস, নস্কর, দাস (মৎস্যজীবী ও হাড়ি) জনজাতী এবং কলিগ্রামের একদা পন্ডিত ব্যক্তি সম্প্রদায় গোস্বামীরা সবাই মিলে কলিগ্রামে আঞ্চলিক ভাষা বা বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকেন। যেমন- পাঠান বা রতুয়ার শেরশাবাদ পরগনা থেকে কিছু শেরশা বাদিয়া সম্প্রদায় জনজাতি নিজেদের মধ্যে বাদিয়া ভাষায় কথা বলেন।

তথ্যপঞ্জী

☆ The tribe and caste of Bengal - H.H. Risley

☆ কলিগ্রামের পরিচয় - কৃষ্ণ বিনোদ গোস্বামী।

☆ মালদহের ইতিহাস ও জেলা সমগ্র - আব্দুস সামাদ।

☆ মালদহ জেলার ইতিহাস- প্রদ্যোৎ ঘোষ।

☆ মালদা জেলার ইতিহাস চর্চা- অধাপিকা- সুস্মিতা সোম- গৌড় কলেজ।

চাঁচলের হিন্দু জনজাতি

ভৌগোলিক আকৃতিগত দিক দিয়ে মালদা জেলাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- (১) বরেন্দ্রভূমি (২) দিয়ারা (মধ্যভূমি) ও (৩) টাল ভূমি (অঞ্চল)। তার মধ্যে চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা অঞ্চল দুটি টাল অংশে অবস্থিত। টাল/তাল এর আক্ষরিক অর্থ জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি বা জলাভূমি, টাল অর্থাৎ তির্যক বা ঢালু বা টিলা (আবার টল্ - চঞ্চল) খাল বিলে পরিপূর্ণ নিচু ভূমিকে বোঝায়। যা হোক অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই চাষ আবাদ, রুজি-রোজগার আর কিছু শিক্ষিত লোক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ কর্মের তাগিদে চাঁচলে (সমগ্র থানা অঞ্চলে) আসতে থাকে। সবথেকে বেশি লোক এসেছে বিহার থেকে কারন খরবা (অধূনা চাঁচল) থানাটি পূর্ণিয়া জেলাভূক্ত ছিল এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশ থেকে ও বেশ কিছু লোক এখানে প্রবেশ করেছে কারণ অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগে আমরা বেশ কিছু দিন ছিলাম। ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মানুষ (মুসলীম জনগোষ্ঠির কথা পরে আলোচিত হয়েছে) নিজ নিজ পেশায় তাদের জীবন ধারনের উদ্দেশ্যে চাঁচল এলাকায় এসে ভীড় জমিয়েছে। চাঁচল থানা অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে তন্তবায় তাতী জনজাতীর লোকেরা (যারা তাঁত বোনার কাজে দক্ষ ছিল) এসেছে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতী মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এখানে খাল, বিল, নদী, নালা, জলাভূমি, মাছ ধরিবার জন্য ঝাকে ঝাকে চলে এসেছে। ভারত বর্ষে মৎসজীবীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ার কারণ হল ভারতের তিন দিক সমুদ্র এলাকা এবং প্রচুর পরিমানে নদ-নদী আছে বলেই এরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। এদের মধ্যে রয়েছে জালিয়া, কৈবত্য, মালো, ঝালো-সালো, জেলিয়া, মাছুয়া, জেলে-মাহিষ্য ইত্যাদি শ্রেণী ভুক্ত জনজাতির লোকেরা রয়েছে।

চাঁচল জেলে পাড়ায়, পাহাড়পুর, মালো পাড়া, ভাকরী, সিহিপুর, সূতী, সাহাবাজ পুর, বাকিপুর, কলিগ্রাম, মালতিপুর, খরবা, শ্রীরামপুর মতিহারপুর প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর পরিমানে ছরিয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চাঁচল জেলেপাড়ার

চন্দ্রমোহন মহালদারের পিতা বিহারের কাটিহার জেলা থেকে ১২০৫ সাল নাগাদ এখানে এসেছিলেন। এই জেলে পাড়াটি পুরাতন রাজ প্রাসাদের পেছনে অবস্থিত এটি চাঁচলের প্রাচীন জনবসতি হলেও রাস্তাঘাট ও মানুষের আর্থিক অবস্থার তুলনা মূলক ভাবে খুব বেশি পরিবর্তন ঘটে নি। কারণ হিসাবে বলা যায় এরা মৎস্য পেশাকে আকরে ধরে আছে ইদানিং বেশ কিছু ছেলেমেয়ে লেখা পড়ায় মন দিয়েছে।

ব্রাহ্মন জনজাতি ঃ কলিগ্রামের গোস্বামী পরিবারের লোকেদের পান্ডিত্যের জন্য এক সময় খ্যাতিলাভ করেছিল (কলিগ্রাম পর্বে আলোচিত হয়েছে) আর পাহাড়পুর, মকদমপুর এবং চাঁচলের বিভিন্ন এলাকায় মালতীপুর সহ যে ব্রাহ্মন লোকেরা বসবাস করছেন তাহারা পূজা পার্বনের উদ্দেশ্যে চাঁচলে এসেছিল। কিন্তু বামুন পাড়ার চাঁচল ওল্ড রাজ প্যালেসে বা চাঁচলের জমিদারী সেরেস্তায় ডাক্তার, ম্যানেজার, আমলা, খাজাঞ্চী, কেরানী প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত ব্যাক্তিরা সুদুর কোলকাতা ও হুগলী থেকে এসেছিলেন। রানী সিদ্দেশ্বরীর বোনের ছেলেরা হুগলীর জিরাট থেকে এসেছে সুরেশ মুখার্জ্জীর পড়িবার রানীমার ডাকে এসেছিলেন বামুন পাড়ায় (বামুন পাড়া অর্থাৎ বামুন প্রধান পাড়া মধ্য পদলোপী কর্মধারয় সমাস, যেমন- জেলে প্রধান পাড়া- জেলেপাড়া) বর্তমান বামুন পাড়ার প্রবীন ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র নাথ মুখার্জীর ঠাকুরদা স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার মুখার্জী হুগলীর বাঁশ বেড়ে থেকে এখানে রাজ ষ্টেটের সেরেস্তায় কাজের সুবাদে এসেছিলেন। রানীমা সিদ্ধেশ্বরীর মেয়ের ছেলে গিরিশ ব্যানার্জীর পৌত্রগণকেও ডাক্তারী পেশায় এবং জমিদারী সেরেস্তায় ম্যানেজার, করনিক ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। কারন বামুন পাড়ার লোকেরা কমবেশি সকলেই রাজবাড়ীর পরম আত্মীয় ছিলেন।

কোচ রাজবংশী, তীয়র, কোচবিহারের কোচ রাজাদের সময় থেকে এ থানায় প্রচুর পরিমানে কোচ রাজবংশীরা বসবাস করে আসছে। প্রাচীন রিপোর্টে দেখা যায় কোচ রাজবংশীদের একাংশ ধর্মান্তর করনের ফলে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত

হয়েছে। রিজলি তার লেখায় তিয়রদের বিহারের দ্রাবিড়ীয় মৎস্য সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলার ৬৩টি জাঁতির মধ্যে এরা অন্যতম। সাওতাল, মুন্ডা, সাঁতাল পশ্চিমবঙ্গের ৪১টি উপজাতির মধ্যে এর অন্যতম। এই সাওতাল শব্দের অর্থ হল পবিত্র অবলম্বন কারী। এরা প্রচুর সংখ্যায় ছোট নাগপুর, রাজমহল ও ঝারখন্ড এলাকা থেকে চাঁচলের মেঘডুমরা, দক্ষিণ শহর, বঙ্গপাল, কান্ডারন, মধূবনা প্রভৃতি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। ধর্মের দিক থেকে এরা জড়োপাসক তাই এরা বিশেযতঃ কৃষ্ণপাথর ও ফুল প্রভৃতিকে প্রতীক হিসাবে পূজা করে।

মুশহর, বেলদার এই জাতি ভুক্ত লোকেরা চাঁচল থানা এলাকায় প্রচুর পরিমানে বসবাস করে আসছে। পুকুর খোরার কাজে এরা সাধারনত খুব নিপুন এবং দক্ষ হয়ে থাকে। চামার, মুচি, চর্মকার, রবিদাস, মেথর, রুইদাস, ডোম সমাজের আচার ব্যবহারে এরা হিন্দু সমাজের অত্যন্ত নীচু পর্যায়ে এদের অবস্থান। গরু ছাগলের চামড়া, পরিস্কার করা, সমাজের নোংরা আবর্জনা সব এরাই পরিচ্ছন্ন করে সমাজকে দুষনমুক্ত রাখে। বাঁশ থেকে তৈরী ডালি, কূলা, ডালা এবং বিবাহের কিছু সামগ্রী তৈরীর জন্য এদের কুটির শিল্পী বলা যায়। বিভিন্ন জীব জন্তুর চামড়া ছাড়িয়ে জুতা তৈরী করতেও এরা খুব পটু। চাঁচলের ডোমপাড়া, কলিগ্রাম, সিহিপুর ছাড়াও চাঁচল থানার বিভিন্ন এলাকায় এরা বসবাস করে আসছে। **'চর্ম তম্মির্নিং পাদুকাদিং করোতি'**। পরাশর মুনির মতে চন্ডালীর গর্ভে তীতরের ঔরসে চর্ম্মকারের জন্ম হয়েছিল। মনুর মতে বৈদেহীর গর্ভে বা ঔরসে চর্ম্মকারের উৎপত্তি হয়েছিল। আগেকার দিনে চামারদের বিবাহে ব্রাহ্মন পুরোহিত রা (যারা পরের হিত বা মঙ্গল কামনা করে থাকে ঠাকুরের কাছে) যেত না ফলে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারাই পূজা ও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হত। কিন্তু সাওতাল পরগনায় সমাজচ্যুত কনৌজী ব্রাহ্মনেরা এদের বিবাহে ও পূজা পার্বণে পৌরোহিত্য করে থাকেন।

মারোয়ারী আগরওয়ালা, জৈন জনজাতি লোকেরা উনবিংশ শতাব্দীর

মাঝামাঝির দিক থেকে ব্যবসা বানিজ্যের সুবাদে রাজস্থান বা কোলকাতা থেকে চাঁচল বাজার তথা চাঁচলের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস আরম্ভ করেছে। ব্যবসা এদের প্রধান জীবিকা অন্য পেশায় এরা অতটা দক্ষ নয়। সম্প্রতি আগরওয়ালা সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কেও ডাক্তারী কেও অন্য চাকরী কর্ম করছে। আগে এরা আতব চালের ভাত এবং নিরামিশাসী ছিল কিন্তু ইদানিং এই সমাজের ছেলেরা (যুব সম্প্রদায়) একটু একটু মাংস খেতে শিখেছে এবং বাঙালীদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

এছাড়াও চাঁচল থানা অঞ্চলটিতে কুশিদজীবী পোদ্দার বা স্বর্ণকার যাদের পেশা সোনার গয়না তৈরী করা এছাড়া প্রচুর পরিমানে হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুয যাদের পেশা বাঁস থেকে কুলা ডালি ইত্যাদি তৈরী করা-এরাও প্রচুর পরিমাণে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে।

তথ্যসূত্র

☆ The Trib and caste of Bengal- H.H. Risley

☆ মালদা জেলার ইতিহাস - প্রদ্যোৎ ঘোষ

☆ জেলা মালদহের ইতিহাস- আব্দুস সামাদ

☆ মালদা জেলার ইতিহাস চর্চা- অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম।

চাঁচলের মুসলিম জনজাতি

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের (৫৭১-৬৩৩) জন্মের পর ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু সূফী, দরবেশ ও পীরসাহেব গন ভারত উপকূলে পারি দেয়। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয়ের পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ সিরাজ-উদ্ দোল্লার পতন পর্যন্ত ৫৫০ বছরের এই মধ্য বর্তী সময়ে বাংলায় মুসলমান সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে। চাষ - বাসের কাজে দক্ষ এবং পরিশ্রমী বলে মুসলমান ও শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায় চাঁচল থানা অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে এদের বসতি গড়ে উঠেছে। জমিদারী শেরেস্তায় কাজ কর্মের সুবাদে ও মুসলমান জন জাতির লোকেরা এতদ্ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। ইসলাম ধর্ম সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত যথা - শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়। সারা মুসলীম দুনিয়ায় সুন্নীরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রায় ৮০ ভাগ, বাকিরা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। চাঁচল থানা অঞ্চলে বেশির ভাগ লোকরাই সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত। সুন্নীদের মধ্যে হানাফী সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের সংখ্যা বেশি। আবার হানাফীদের দুটি শাখা আছে যথা (১) দেওবন্দ ও (২) ব্রেলভি। হিন্দু ধর্মে যেমন — ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র চারটি বর্ণ ভেদ আছে ঠিক তেমনি ইসলাম ধর্মেও চারটি শ্রেণী দেখা যায় যেমন - আশরাফ, আজলাফ, আতরাফ ও আরজল। আশরাফ শব্দের অর্থ ভদ্র ও অভিজাত সম্প্রদায় তাদের চারটি ভাগ হল - সেখ, সৈয়দ, মোঘল ও পাঠান চাঁচল থানা অর্থাৎ টাল / তাল এলাকায় যে মুসলমান সুন্নী সম্প্রদায়ের পাঠান মুসলমানেরা বসবাস করছে তাদের সেখ বলা হয়। সেখরা নিজেদের অভিজাত মুসলমান বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। পাঠানরা নিজেদের মধ্যে হিন্দি ভাষায় এবং বাকি মুসলমানগন বাংলা ভাষায় কথা বলে থাকেন। তবে গ্রামের দিকে মুসলমান সমাজের মধ্যেও একটি আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। মুসলীম জনসমাজে ৬/৭ টি উৎসব (পরব) থাকলেও হিজরি নবম মাসে বা রমজান মাসের শেষে ঈদ্ এদের সবচেয়ে বড় পরব। সারামাস ধরে মুসলমান জনগোষ্ঠির লোকেরা রমজানের উপবাস করে থাকেন। রমজান শেষে পবিত্র ঈদ উৎসব পালিত হয়। এই রমজান মাসটি মুসলীম জন

সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদা পূর্ণ প্রধানত তিনটি কারণে (ক) রমজান মাসেই কোরানের পবিত্র বাণী নির্গত হয়েছিল। (খ) এই রমজান মাসেই হজরত মহম্মদ মেরাজে গেছিলেন। (গ) এই রমজান মাসেই হজরত মহম্মদ আল্লাহর নিকট থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি আর এই শান্তির বাণী পৌছে দেওয়ায় ইসলামের পবিত্র কাজ।

শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায় চাঁচল ব্লক-১ এলাকায় বাদিয়া জনবসতি সম্প্রদায় মানুষের সংখ্যা খুব কম কিন্তু চাঁচল-২ ব্লক এলাকার ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের মধ্যে কম বেশি সব জায়গায় প্রচুর পরিমানে বসতি স্থাপন করেছে। জালালপুর, হজরতপুর, ধানগারা, বিশনপুর, চন্দ্রপাড়া, বাহারাবাদ, যানপুর, হুসেনপুর প্রভৃতি বিশেষত শেরসাবাদ পরগনা থেকে আগত এই বাদিয়া জনজাতি সম্প্রদায় এই সব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে। ধর্মগত দিক থেকে এরা ইসলাম ধর্মের অন্তগত হলেও মূল সম্প্রদায় থেকে এরা কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠের অধিকারী। সমগ্র মুসলিম দুনিয়া যে হানেফি, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বেলী এই চারটি মতবাদ অনুসরন করে থাকেন এই বাদিয়া জনজাতি সম্প্রদায় তার কোনটিই অনুসরন করেন না। এরা নিজেদের 'লা-মজহবী' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রখ্যাত গবেষক এম.ও.কার্টার এর মতে শেরশাবাদিয়া বা বাদিয়া নামটি শেরশা পরগনা থেকে এসেছে। শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের নারীদের লাজ লজ্যা অত্যধিক এরা এখনও পর্দা প্রথা কে মেনে চলে। সাধারণ মুসলমানদের থেকে বাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা, শারীরিক আকৃতি, গঠন, নাক ও মুখাকৃতি আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী।

তথ্য সূত্র

★ শেরশা বাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি - মীর রেজাউল করিম

★ *The Report on the Survey and settlement of Malda (1928-35)- M.O. Curter*

★ মালদা জেলার ইতিহাস চর্চা - সুস্মিতা সোম

★ মালদা জেলা সমগ্র- আবদুস সামাদ

চাঁচলের পূজা-পার্বন ও মেলার কথা

চাঁচলের পূজা-পার্বন মেলার কথা বিষদ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় মেলার তাৎপর্যগত অর্থ হল মেলা অর্থাৎ মিলন, আদান প্রদান অথবা নিজেদের মধ্যে ভাব-বিনিময়। সংস্কৃত মিল ধাতু থেকে এসেছে এই মেলা শব্দটি। সমাজবদ্ধ মানুষ যখন তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে বসে মেলার আসর। কখন নদীর ধারে আবার কখন সামাজিক পূজা পার্বনকে কেন্দ্র পূজা মন্ডপের সামনে বসে মেলার আসর। 'মেলা' শব্দের অভিধান গত অর্থ হল এই রকম অনেকটা চওড়া জায়গায় বা প্রশস্ত এলাকায় সমাজ, সভা, তীর্থ ইত্যাদি বহু লোকের এক সাথে সমাগম, কোন পূজা পার্বন বা মহোৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে এক জায়গায় মিলিত হওয়া। মানব সমাজে 'মেলক'-কে স্থির করে নারী ও পুরুষের বিবাহ দেওয়া হয়। এই 'মেলক' অর্থে মিলন বা সমূহ বোঝায়। তাই মেলক শব্দটির ঐক্য কারক বা মিলন কারক। (মেলা মিল + ঘঞ) ঐক্য, মিলন, জনগনের উৎসব স্থানে লোকারন্য তাই মেলা বা মেলক (মেল + কন) সঙ্গ, সহবাস (মিল নক) অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলিত হয়। বঙ্গীয় শব্দঘোষিত মেলা অর্থে সমাজ, সভা বা দলকে বোঝানো হয়েছে। যাহোক মেলা শব্দটি কে নিয়ে শব্দ বাজি খেলা আমার ভালো লাগে নি। কারন শব্দ বাজি খেলা নিয়ে আমার কাজ নয়। কারন শব্দ বাজির ওপরে তো এখন প্রতিবন্ধকতা লাগিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নির্দিষ্ট সীমার বেশি আওয়াজের শব্দ বাজি পোড়ানো বা খেলা এখন নিষেধ তাতে নাকি কর্ণ গোচরে যে পর্দা আছে তার ক্ষতি হয়। যা হোক মেলাকে যদি আমরা গ্রামবাংলার কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্পের প্রদর্শনী বলি তাহলে খুব বেশি ভুল হবে না। অকারনে ব্যাকরন চর্চা করাটাও আমার ধাতে সয় না তাই তো বিপদ গ্রস্ত হলেই আমি বাংলা শিক্ষক আমার কলিগ ভ্রাতৃসম সুখেন্দু শেখর শিকদার ও শুভময় গোস্বামী এবং বন্ধুবর অনিরুদ্ধ সাহার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। চাঁচল থানা অঞ্চলের মেলাগুলির বিবরন যতটা পারি দেওয়ার প্রয়াস করেছি মাত্র।

__চাঁচল বাজারের বারোয়ারী দুর্গা পূজার মেলাঃ__ এটি চাঁচল বাজারে মৌজা-৭০ (চাঁচল সিট নং ২- তে) অবস্থিত। আগেও বলেছি পুরাতন রাজবাটি ছেড়ে চলে গেলে ১৯০৪ সালে রাজা বাহাদুর শরৎ চন্দ্র যখন নতুন রাজবাড়ীতে (বর্তমান চাঁচল রাজবাড়ী সিঙ্গিয়া মৌজায়) চলে যাওয়ার পর মরা মহানন্দার এপার অর্থাৎ চাঁচল মৌজাটি কিছুটা উপেক্ষিত হতে থাকে। বিগত ১৯০৫-০৬ সাল নাগাদ থেকে এখানে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয় চাঁচলের শিক্ষিত জ্ঞানী গুনী ব্যবসিকদের আর্থিক সহযোগিতায়। এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সপ্তমী, অষ্ঠমী, নবমী ও দশমীর দিন মন্ডপের সামনের ফাঁকা মাঠে বসে মেলা। চাঁচল বারোয়ারী দুর্গামন্ডপের জায়গাটি অর্থাৎ এক শতক পরিমাণ জায়গা স্থানীয় বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী নারায়ন প্রসাদ রামের পিতা এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রয়াত মতি কিষণ রাম মহাশয় পূজার নিমিত্ত দান করে গেছেন। এখানেই পরবর্তীতে পুনঃনির্মান করা হয়েছে বর্তমান বারোয়ারী পূজা মন্ডপটি। আমাদের ছোট বেলাতেও (১৯৬৫-৭৫) দেখেছি প্রচুর লোক সমাগম হত এই মেলায়। পাহাড় পুরের চন্ডিদেবীর পূজাকে বাদ দিলে এই বারোয়ারী পূজাটিই ছিল চাঁচলের একমাত্র পূজা। পরবর্তী কালে ব্লকের পূজো এবং বিভিন্ন পাড়ার ক্লাবের পূজাগুলি বেড়ে এখন ১৩টি দুর্গাপূজা হয়।
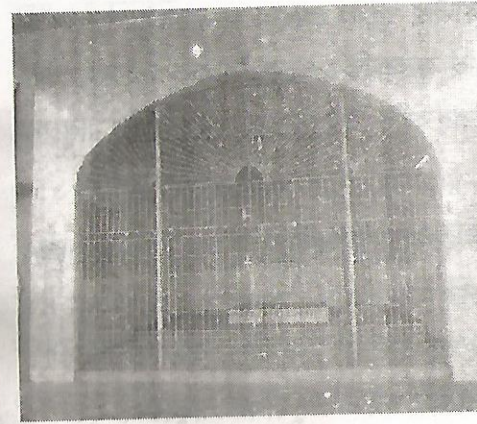
চরক মেলা (চাঁচল)ঃ এটি চাঁচলের পোদ্দার পাড়ায় (চাঁচল মৌজা -৭০) মেলাটি বসে। এই মেলাটি চৈত্র সংক্রান্তির দিন বৈকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এখানে প্রচুর লোক সমাগম হয়। গোড়াটি বাঁধানো যে অশ্বত্থ (পিপল) গাছটি আছে। সেই গাছ তলাতেই শ্মশান কালীর পূজা হয়ে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। এটি মূলতঃ চাঁচল

সর্দার (হাড়ি পাড়া) পাড়ার হাড়ি সমাজের জাতীয় উৎসব। এই মেলার সেবক বৈর গাছিতে তাহার বাড়ি থেকে সেবক একটি মোখা বা ম্যাস্ক বা প্রতীকি মুখোস মা কালীর জীব বাহির করা মুখাকৃতি (শোলার তৈরী) মোখাটি পরে একহাতে একটি তলোয়ার নিয়ে ঢাক-ঢোল সহ বহু লোক একসাথে একবার সকালে এবং একবার সন্ধ্যাবেলায় এই দেবস্থানটিতে আসেন। এখানে একটি চরক গাছে-মানুষকে নিয়ে চরকি ঘোরানোর ব্যবস্থা ও আছে। এই চরকের গাছটি মেলার পর পাশ্ববর্তী লাল মোহন পালের পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়- তারপর সারাবছর এই শাল গাছটিতে আর দেখা যায় না ঠিক পূজোর সাত দিন আগে একদিন রাত্রে সিহিপুর শ্মশান থেকে একটি মরা মানুষের মাথার খুলিকে নিয়ে এসে সেই রাত্রেই পূজো দেওয়ার রীতি দীর্ঘ দিন ধরে প্রচলিত আছে। বৈরগাছির বসন্তদাস এবং পরবর্তী কালে তাঁহার বংশধররা এই পূজাটি করে আসছেন।

মোবারক পুর কালীর মেলা ঃ এটি চাঁচল ১ নং ব্লকের শীতলপুর ও স্বরুপগঞ্জ এর কাছাকাছি মোবারকপুর গ্রামের দীর্ঘ দিনের কালীপূজা। সমতলভূমি থেকে বেশ উচুতে বাধানো থানে প্রতিবছর কালী পুজোর সময় প্রায় দু দিন ধরে এই মেলা বসে। বৈকাল থেকে রাত্রি অবধি ৭/৮ হাজার লোক সমাগম হয় এই মেলায়। দীপাবলীর অমাবস্যায় মাঁকালীর পূজো শেষ হলে এখানে প্রচুর পাঠা বলী হয়। লোক মুখে কথিত আছে জনশ্রুতি থেকে- হরচন্‌পুরের হোলি, কলিগ্রামের গোলি আর মোবারকপুরের বলী- বিখ্যাত হয়ে আছে-এখন মানুষের মুখে মুখে।

আশাপুর গঙ্গাপূজার মেলাঃ এটি খরবা (৪৪) একদা খারোয়া/KHAROWA ১৮৯৬ থেকে খরবা থানা ছিল তাহার নিকট মৌজা আশাপুর (৪৫) এবং ৪৬ কৃষ্ণপুর মৌজার মাঝামাঝি এলাকায় বর্তমান আশাপুর বা চুরামনঘাট এর কাছে এপাড়ে নাগর নদী খাতটির উত্তর পশ্চিম পাড়ে বালুকাময় চরভূমি বা মহানন্দা বাঁধ এর নীচে এই গঙ্গা মেলাটি বসে। এই নদীটি আসলে মহানন্দার উপনদী কুলিকের (কুলিক নদী রায়গঞ্জ) জলধারা বহন করে আসছে। প্রতি বছর পৌষ

সংক্রান্তির দিন নদীর ঘাটে খরবা ও আশাপুর বাসির সহযোগিতায় একটি বিশাল মেলার আয়োজন করে থাকেন। এই মেলাটি আসলে ''শ্রী শ্রী গঙ্গাদেবীর আবির্ভাবোপলক্ষ্যে" গঙ্গা স্নানের মেলা। খরবা তথা চাঁচল থানার ৮/১০ হাজার লোক সমাগম হয় এই মেলাতে। বহু মনোহারী দ্রব্যের দোকান, কাঠের আসবাব পত্রের দোকান এবং বহু মিষ্টির দোকান বসে এই মেলাতে। আশাপুরের উৎসাহী মানুষ এবং যুব সম্প্রদায়ের সুস্থ পরিচালনায় মেলাটি বর্তমানে আশাপুরের মানুষের জাতীয় উৎসবে পরিনত হয়েছে। মেলাটির প্রাচীন বৈশিষ্ট নদীতে গঙ্গা স্নান করে ভাজা (মুড়ি) ও গরম-গরম আলুর দম না খেলে মনে হয় মেলা যাওয়া সফল হলো না।

বলরাম পুরের মনসামেলা বা বিষহরির মেলা ঃ এটি বর্তমান চাঁচল থানা সীমানার পূর্ব দিকে দিনাজপুর সীমান্তে মৌজা ১৫৭ বলরামপুর কালিপাড়া অঞ্চলে বলরামপুর গ্রামে মহানন্দা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। পাকা ইটের তৈরী সুন্দর মনসা মন্দির প্রাঙ্গনে বিজয়া দশমী থেকে লক্ষীপূজা পর্যন্ত চলে মনসা বা বিষহরি-অর্থাৎ বিষ বা সাপের বিষ হরন/ধারন করেন যে দেবী/শিব কন্যা মাঁ মনসা" বহু মনোহারী দ্রব্য মিষ্টির দোকান ও কাঠের আসভাব পত্রের দোকান বসে এই মেলায়।

মহানন্দাপুরের গোষ্ঠ মেলা ঃ চাঁচল ব্লক-১ এলাকায় মল্লিকপাড়ার নিকটে মৌজা-৫ মহানন্দপুরে বসে এই গোষ্ঠ ঠাকুরের মেলাটি। গোষ্ঠ ঠাকুর অর্থাৎ গোষ্ঠ লীলাকৃত ঠাকুর শ্রী শ্রী কৃষ্ণের গোষ্ঠাষ্ঠমী কৃত্য পুজা বা গোপুজা বা গোস্বামী মতে গোপাষ্ঠমী। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ঠাকুরের বিগ্রহ তৈরী করে এখানে পুজা অর্চনা করা হয়। এখানে আগে ১৫ দিন বা একমাস ধরে মেলা বসত এবং মেলায় গান বাজনা এমনকি সিনেমা হল পর্যন্ত অস্থায়ী ভাবে বসতো। গোষ্ঠ ঠাকুরের মেলাটি এলাকার প্রাচীন মেলা ছিল এখন মেলাটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে সম্প্রতি একটি আট চালা মন্দির গৃহ তৈরী হয়েছে। এছাড়াও এখানে কালীপূজা ও শিবমন্দির আছে। এখানেই সপ্তাহে তিন (৩) দিন নিয়মিত ভাবে হাট বসে।

এলাকার প্রবীন ব্যক্তি হরেন্দ্র নাথ সাহা (প্রাক্ত সহ-সভাপতি চাঁচল পঞ্চায়েত সমিতি) ,বিশ্বনাথ সাহা, পঙ্কজ সাহা, পঞ্চু সাহা ও আমার বন্ধুবর দিলিপ সাহা ও অচিন্ত কুমার থোকদারের মুখে শুনেছি এবং বিভিন্ন বই থেকে এই তথ্যই পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও কান্ডারনের পাশে বঙ্গপাল (১০৯) এলাকায় একটি সাওতালী মেলা বসে। এটিকে হুরহুরিয়ার মেলা বলে থাকে অনেকে।

মাধাইহাট গম্ভীরা তলায় মালদা জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মেলাটি প্রায় ১২০০ বছরের পুরাতন চড়ক মেলাটি বিখ্যাত।

বলরামপুরে প্রায় ৬০০ বছরের গাজীপীরের মেলাটিও এলাকার প্রাচীন মেলা।

কোবাইয়া গ্রামে প্রায় ৫০০ বছরের ২দিন ব্যাপী প্রাচীন মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

চন্দ্রপাড়ায় পুরনো বাসী কারবালার মেলাটিও বেশ বিখ্যাত।

গোয়ালপাড়ায় অবস্থিত পাটনী পাড়ায় কয়েক শ বছরের বেশ পুরাতন কালী পূজার মেলাটি এলাকার মানুষের কাছে স্মরনীয় হয়ে আছে। পাহাড়পুরে চন্ডিমন্ডপের সামনে ১-দিনের রাসমেলা এবং মালতীপুরে দীপাবলীতে একদিনের কালী পূজার মেলাটি ও এলাকার মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়ে আছে।

তথ্যপঞ্জী

☆ মালদহ জেলার ইতিহাস ও জেলা সমগ্র - আব্দুস সামাদ।

☆ মালদহ জেলার ইতিহাসচর্চা - অধাপিকা সুস্মিতা সোম।

☆ ফুল পঞ্জিকা- মদন গুপ্ত

☆ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা- অশোক মিত্র

চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল

চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেলের কথা

১৮৭২-৮২ সাল মধ্যে মহানন্দার ওপারে সিঙ্গিয়া (৬৮) মৌজায় নতুন রাজবাড়ী তৈরী হলে ঠাকুরবাড়ী লাগোয়া পুলিশ ব্যারাকে চাঁচল ইংলিশ স্কুল আরম্ব হয়। রাজাবাবু নতুন রাজবাড়ীতে ১৯০৪ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহ প্রবেশ করেন এবং পুরাতন রাজবাটির কয়েক খানি ঘর শিবরামবাবুর (লেখক শিব্রাম) পরিবার কে কিছু টাকা মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে এখানে ছেড়ে চলে যান। আর কয়েক খানি ঘরকে হিন্দু ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য ছেড়ে দেন। বামদিকে ছবিতে এটি বর্তমান চাঁচল রাজ হিন্দু হোস্টেল ১৯৪০ সাথে পুনঃ নির্মান হয়েছে। এই হোস্টেলের মাটির তলায় এর পুরাতন রাজ প্রাসাদের ভীত, পিলার ও পাকা মেঝে কিছুদিন আগে ও মেঝেটি পরিষ্কার ঝক্-ঝক্ করছিল এখন মাটি চাপা পড়ে রয়েছে। প্রায় ৩০০ বছর আগের একটি কূয়ো (কূপ) এখনও হোস্টেল সিমানার ভেতরে রয়েছে। এই হোস্টেলের অবস্থান হল মৌজা-চাঁচল, জে.এল. নং-৭০, খতিয়ান নং ৪৯৩/১, দাগ নং ৬৪৫/১১১৮ মোট জমির পরিমান ৭১ শতক (দালান সহ হিন্দু ছাত্রাবাস) নাম বরাবর আছে।

১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিকার আইনের ৪৯৩ নং এর ৬ ধারা অনুসারে ট্রাষ্টী কালী কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাপ্ত। আমাদের জেনে রাখা ভালো ১৯৪৬ সালের ১০ই এপ্রিল কলকাতার হ্যারিংটন ষ্ট্রিটে রাজা শরৎচন্দ্র মারা যাওয়ার আগেই হোষ্টেলের জায়গাটি এবং চাঁচল ৭০ মৌজার উত্তরে খেলন পুর ৬৭ মৌজায় ৫১ শতক মাটি মুসলমান ছাত্রাবাস হিসাবে দিয়ে গেছেন। এলাকার জনহিত কর প্রজা মঙ্গলকামী রাজা শরৎচন্দ্রের গুনগান আর কত করবো। কিন্তু দুঃখের কথা হল চাঁচল রাজ হিন্দুহোষ্টেলটি চালু থাকলেও মুসলমান ছাত্রাবাসটি বহুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এতে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপটিও নেই নোংরা রাজনীতির স্বীকার আমরা চাঁচল বাসী একে অপরের গায়ে কাঁদা ছড়াতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি। বিগত ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত চাঁচল মুসলমান ছাত্রাবাসটি চালু ছিল। সমাজের কোন ভালো মানুষ কোন ভালো কাজ করতে এলেই আমাদের শুরু হয়ে যায় সমালোচনা (কারণ আত্ম সমালোচনা করবার অবকাশ আমাদের নেই) আর অপরকে কটাক্ষ করা। এই মুসলমান ছাত্রাবাসেই কবি শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর বাল্যকালের বন্ধু কাবিল হোসেনের কাছে অঙ্ক শিখতে আসতেন (ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা) থাক সে কথা গত ১লা এপ্রিল ২০০৫ সালে তাপসবাবু (তাপস কুমার দাস সিদ্ধেশ্বরী) ও ম্যানেজিং কমেটির দ্বারা আমি (লেখক মেঘনাদ দাস) হিন্দু হোষ্টেলটির দেখভালের (Hostel Superintendent) দায়িত্ব ভার পাই এবং রান্নাঘর সহ ১২টি ঘরের জানলা-দরজা ও সামনের দেওয়াল রং ও মেরামতির কাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের বর্তমান পরিচালন সমিতি সহ-শিক্ষক অনিরুদ্ধ বাবু, প্রধান শিক্ষক-মাননীয় আসরারুল হক মহাশয় এবং সম্পাদক গৌতম কুমার বর্মন বাবু আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমার পুত্র সম ছাত্রদের কতটা স্নেহ ভালবাসা দিতে পেরেছি তা আমার মুখে শোভা পায় না। এখানে রয়েছে ১২টি ঘর একটি ঘর হোষ্টেল সুপারের অফিস ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বাকি ১১টি ঘরে ৩টি করে বেড আছে অর্থাৎ সর্বচ্চ ৩৩ জন বর্ডার এখানে ভালভাবে অপ্পখরচে থাকতে পারে। এখানে থাকলে ছাত্রদের (বর্ডারদের) সিট রেট-২৫/- এষ্টাব্লিশমেন খরচ-২৫/- এবং ইলেকট্রিক বিল-৫০/- টাকা

অর্থাৎ-১০০ টাকা প্রতি মাসে এবং খাওয়ার জন্য মেস খরচ বাবদ ৫৫০ টাকা লাগে। দীর্ঘদিনের (প্রায় ২০ বছর) রাধুনী সুনীল ঘোষ বর্ডার দের রান্নার কাজে নিয়োজিত আছে। আমাদের প্রজামঙ্গলকামী রাজা এলাকায় হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য যে বিশাল কাজ তিনি করে গেছেন এটি রক্ষণা বেক্ষনের দায়িত্ব আমার একার নয় আমাদের সকলের হওয়া উচিৎ। এটি চাঁচলের গর্ব, আমাদের গর্ব সকলের গর্ব। এলাকার স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিক রসিক রাজা শিব্রাম চক্রবর্তীর বাল্য স্মৃতি বিজড়িত এই চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেল। আমরা প্রায় ভুলেই গেছি শিবরাম বাবুকে তার স্মরনে চাঁচল বাসষ্ট্যান্ড থেকে পাহাড় পুরগামী রোড টির নামকরন হয়েছে- "শিবরাম সরনী" ব্যাস এ টুকুই যথেষ্ট। ১৯৩৭-৩৮ সালে পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভাঙ্গা বাড়ির পুরাতন ইট ও জানালা দরজা দিয়েই তৈরী হয়েছে বর্তমান চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেল। এই হোষ্টেলে থাকা কালীন শিবরাম তাঁহার "অদ্বিতীয় পুরস্কার"-গল্পটি লেখেন। এক সময় এই হোষ্টেলে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর নাটক, গান বাজনার আসর বসত। চাঁচলের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মূল আসর বসত এই হোষ্টেলে। দুই দিন ব্যপী বামুন পাড়া ও বাজারের নাট্য প্রেমী মানুষ এখানেই প্রতিবছর নতুন নতুন নাটকের আয়োজন করতেন। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যেবেলা এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হত।

তথ্যপঞ্জী

☆ জায়গার কাগজপত্রের নথি- রাজ হিন্দু হোষ্টেল

☆ ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা- শিবরাম চক্রবর্তী

☆ শিবরাম রচনাবলী- ঐ

ব্যক্তি ঋন

আসরারুল হক-	প্রধান শিক্ষক -	সিদ্ধেশ্বরী স্কুল
গৌতম কুমার বর্মন -	সম্পাদক-	সিদ্ধেশ্বরী স্কুল
তাপস কুমার দাস -	সহ-শিক্ষক -	ঐ
অনিরুদ্ধ সাহা -	ঐ	ঐ
শান্তনু হোড়-	ব্যবসায়ী চাঁচল	
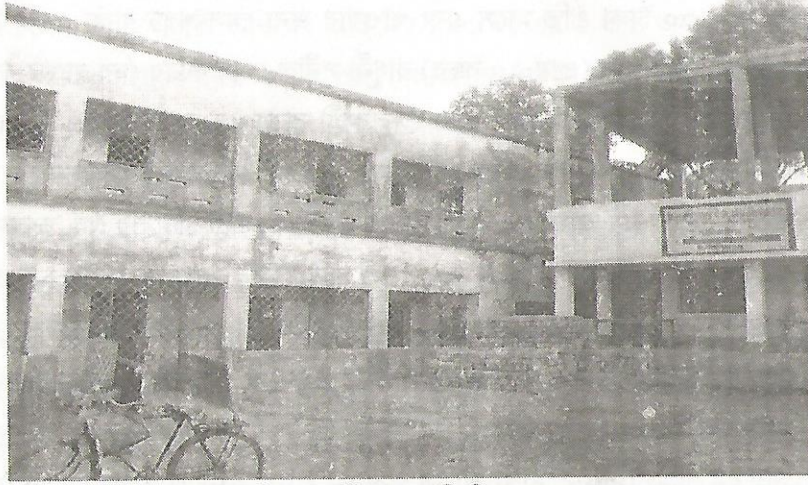
চাঁচল রাণী দাক্ষায়ণী বিদ্যালয়

রাণী দাক্ষায়ণী বিদ্যালয়ের কথা

এলাকার দানবীর রাজার অক্ষয় কীর্তি এই বালিকা বিদ্যালয় তাহার প্রিয়তমা পত্নী আমাদের রাণীমা কলিকাতার দর্জিপাড়ার মেয়ে ছিলেন- রাণী দাক্ষায়ণী দেবী। রাজা শরৎচন্দ্রের বহু অমর কীর্তির মধ্যে এই বালিকা বিদ্যালয়টিও একটি। তাহার জমিদারী এলাকার মানুষের কথা ভেবে তথা নারী শিক্ষার প্রতি খুব অনুরাগী হয়ে রাজাবাবু বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। রাজাবাবুর একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে শেষ জীবনে চাঁচল ছেড়ে চলে যান কলকাতায় আর রাজষ্টেটের ম্যানেজার বাবুরাই দেখাশোনা করতেন জমিদারী। ১৯৪৬ সালের ১০ই এপ্রিল রাজা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর আগেই চাঁচলের কেন্দ্র বিন্দুতে (Heart of the town) মৌজা সিঙ্গিয়া ৬৮ দাগ নং পরিমান ০.৮৭ একর (প্রায় তিন বিঘা) জমি দান করে যায়। সেদিনের শিক্ষানুরাগী মানুষের উদ্যোগে ২৩-০২-১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয় চাঁচল রাণী দাক্ষায়ণী বালিকা বিদ্যালয়। প্রথম দিকে এটি জুনিয়ার বিদ্যালয় ছিল বিগত ১-১-১৯৬৪ সালে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। শ্রীমতি পুষ্প চক্রবর্তী মহাশয়া দীর্ঘ দিন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। ২০০১ সাল থেকে এই বিদ্যালয়টি নতুন হায়ার সেকেন্ডারী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে তৎসহ দুটি ল্যাব বেস বিষয় হিসাবে ভূগোল ও নিউট্রিশন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই

বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার সংখ্যা ২৩ জন এবং মেট্রন ও করনিক সহ অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা ৪ জন। বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি অসীমা ত্রিবেদী এবং সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মন্ডল এবং দিলিপ দাস করনিকের কাছে যা তথ্য পেলাম তা নিম্নরূপ ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে দশম পর্যন্ত ছাত্রী সংখ্যা ১০৪৩ এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সংখ্যা ২৯১ জন প্রায়। লাইব্রেরিয়ানের অভাবে স্কুল লাইব্রেরীটি বন্ধ হয়ে আছে। পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ১৮২৩ টি। অর্ধ শতকের গন্ডি পার হয়ে যাওয়া এই বিদ্যালয়ে ভালো লেখা পড়া ও ফলাফল হয় বলে এলাকার শিক্ষাঙ্গনে স্কুলটির যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। করনিক দিলিপবাবুর দেওয়া তথ্য থেকে বিগত তিন বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

মাধ্যমিক ২০০৬	উচ্চ-মাধ্যমিক ২০০৬
মোট পরিক্ষার্থী- ৯৯ জন	মোট পরিক্ষার্থী-১১২ জন
প্রথম বিভাগ - ৩৫ জন	প্রথম বিভাগ- ১৪ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৪১ জন	দ্বিতীয় বিভাগ- ২৬ জন
তৃতীয় বিভাগ- ০৪ জন	পাশ বিভাগ- ৩২ জন

মাধ্যমিক ২০০৭	উচ্চ-মাধ্যমিক ২০০৭
মোট পরিক্ষার্থী- ৮৬ জন	মোট পরিক্ষার্থী-১০৯ জন
প্রথম বিভাগ - ৩৩ জন	মোট পাশ- ৮১ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ২৫ জন	(N.B. Gradetion System)
তৃতীয় বিভাগ- ০৮ জন	

মাধ্যমিক ২০০৮	উচ্চ-মাধ্যমিক ২০০৮
মোট পরিক্ষার্থী- ৯৯ জন	মোট পরিক্ষার্থী-১১৪ জন
প্রথম বিভাগ - ৩২ জন	মোট পাশ- ৯৯ জন
দ্বিতীয় বিভাগ- ৪৩ জন	
তৃতীয় বিভাগ- ০৪ জন	

আমার ব্যক্তিঋন

শ্রীমতি অসীমা ত্রিবেদী - প্রধান শিক্ষিকা

কৃষ্ণ গোপাল মন্ডল- সম্পাদক দিলিপ দাস- করনিক

এটি চাঁচলের ব্লক রোডে বাসুদেব পাড়ায়া অবস্থিত। চুড়াবিহীন এই বাসুদেব ঠাকুরের মন্দিরটির ঠাকুর কষ্টিপাথরের বিগ্রহ গৃহের তিন পাশে মোজাইক দেওয়া বারান্দা এবং গ্রিল দিয়ে ঘেরা রয়েছে। সুন্দর ঝক্‌ঝকে মসৃন মেঝে যুক্ত মন্দিরগৃহটি পুরাতন হলেও সম্প্রতি এর সংস্কার কাজ হয়েছে বলে মনে হয়। বাসুদেব বাড়ির দুটি পরিবারের মিলিত সহযোগিতায় বাসুদেব ঠাকুরের পূজা-আর্চা হয়ে থাকে। এলাকাটি সিঙ্গিয়া মৌজা ৬৮তে অবস্থিত বর্তমান চাঁচলের মধ্যেই অবস্থান। বাসুদেব বাড়ীর প্রবীন সদস্য শ্রী অজিত কুমার মজুমদার এবং ব্যবসাহী তরুন কুমার মজুমদার বাবুর মুখ থেকে জানা গেল মূর্ত্তিটি ১২শ শতকের সময় থেকেই পূজিত হয়ে আসছে। দেশ বিভাগের পূর্বেই এই পরিবারটি পূর্ব-বঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে এই বিগ্রহটি সঙ্গে এনেছিলেন। এবং তখন থেকেই এই মন্দিরে পূজিত হয়ে আসছে।

বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিদিন নিত্য পূজার ব্যবস্থা থাকলেও মূল অনুষ্ঠানটি হয় দোল উৎসবে হোলির আগের দিন অর্থাৎ দেব দোলের দিন সন্ধ্যেবেলা দোল পূর্ণিমার মধ্যে চাচর উৎসব/বহ্ন্যুৎসব/চাচারী উৎসব বা মেরা পোড়া/নেড়া পোড়া বা বুড়ির ঘর পোড়ানোকে কেন্দ্র করে। মন্দিরেরপূজারী হরিসাধন চক্রবর্তী মহাশয় যা বললেন মহিষের/মহিষাসুরের/অত্যাচারী রাজা কংশেরও হতে পারে) বিচালী/খড়ের তৈরী একটি পুতুলকে বুড়ির ঘরে রেখে চাচারী উৎসব বা বহ্ন্যুৎসব পালন করে থাকেন। এক সময় এই চাচারী/চাচর উৎসব কে কেন্দ্র করে সিহিপুর থেকে চাঁচলের জমিদার বাবুদের সহযোগিতায় এক বিশাল শোভা যাত্রা করে সন্ধ্যেবেলায় বহু লোক এক সাথে পাহাড়পুর চন্ডিমন্ডপ পর্যন্ত যেতেন। এই প্রাচীন চাচর উৎসব থেকে চাঁচল নাম হতে পারে এ-কথা নামকরন পর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকেরাই এই চাচর উৎসব এর আয়োজন করে থাকেন। পূর্ববঙ্গীয় রমনীরা এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে সংসারের অ-শুভ শক্তিকে বিনাশ করে/বিদায় দিয়ে শুভশক্তির আগমন বার্তাকে আহ্বায়ন জানায়। আজ থেকে বহুদিন আগে এই এলাকায় নতুন ফসল তোলার দ্যোতক

হিসাবে বাঙালীরা চাঁচর উৎসব পালন করে থাকতেন। দোল উৎসবের আগে এই অগ্নিদাহনের একাধিক বিজ্ঞান এবং মনস্তাত্বিক তাৎপর্য আছে। ভেড়া অথবা তাজা গাছ পোড়ানো সম্ভবত শস্য দেবতার উদ্দেশ্যে বলি নিবেদনের আদিম প্রথার ধারাবাহী এই উৎসব। ঐ আগুনে যে শষ্যগুলি পুড়ে যায় সেগুলিকে শষ্য ক্ষেত্রে ছড়ানো বা প্রসাদ হিসাবে গ্রহন করার রেওয়াজ ছিল বহুদিন।

ব্যক্তিঋণ

শ্রদ্ধেয় অজিত কাকু (অজিত কুমার মজুমদার)

তরুন দা (তরুন কুমার মজুমদার)

হরিসাধন চক্রবর্তী (পূজারী)

তথ্যসূত্র

☆ মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা-অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম (গৌড়কলেজ)

☆ মালদা জেলার ইতিহাস ও জেলা সমগ্র- আব্দুস সামাদ

নকসাটি চাঁচল মৌজা নং ৭০ সিট নং ২ - উপরে লেখা আছে ডোমরাইফেরী ঘাট

চাঁচল ফেরীঘাট ও মরা মহানন্দার আত্মকথা

মহানন্দা নদীটি নেপালের দক্ষিণ-পশ্চিম হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে কার্শিয়াং শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শিলিগুড়ির (শৈল শহর) পাশ দিয়ে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় প্রবেশ করে। মহানন্দা নদী একটি আর্ন্তজাতিক নদী এবং তার দৈর্ঘ্য ২২৫ মাইল। বয়সের দিক দিয়ে নদীটি প্রাচীন। বিগত ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মুঘল মানচিত্রে তথা An Atlas of the Mughal Empire এর মানচিত্রে এর উল্লেখ্য পাওয়া যায়। ১৭৬৪-৭৩ সাল মধ্যে 'রেনেলের' নক্সা প্রস্তুত কালে দেখা যায় মহানন্দার প্রাচীন ধারা খাতটি একদা চাঁচলের উপর দিয়ে প্রবহমান ছিল। একদা এই প্রাচীন ধারা খাতটি পূর্ণিয়া জেলা অতিক্রম করে মালদা জেলায় প্রবেশ কালে স্বরূপগঞ্জের নিকটে বাংলায় প্রবেশ করে। এই ধারা খাতটি স্বরূপগঞ্জ (১) থেকে চন্ডিগাছি, থাহাঘাটি সিহিপুর (৬৬) চাঁচল (৭০) হয়ে হবিনগর থেকে সাহুরগাছি ও পাহাড়পুরের (১৪৯) পাশ দিয়ে সতীঘাট ছুয়ে (সতীঘাট শ্মশানের

কথা ঐ নাম পর্বে আলোচিত হয়েছে) ১৬৭ বিরস্থলী মৌজা দিয়ে আটঘারা (আটঘারা অর্থাৎ ৮টি ঘারা বা কলসি এই নদী থেকে এক সাথে ভেসে উঠেছিল বলে এই নামকরন) হয়ে মহানন্দা নদীটি কৃষ্ণগঞ্জ, মালতীপুর, গোবিন্দপাড়া, চান্দুয়া এবং সামসী হয়ে নদীটি রতুয়া থানায় প্রবেশ করে। আজও এই মহানন্দার নাম বিভিন্ন লোকমুখে শোনা যায় এটি মহানন্দা খাড়ি কেও বলেন মরা মহানন্দা প্রভৃতি। আজ থেকে ১৫০-২০০ বছর আগে বিগত ১৯২৮-৩৫ সালের সেটেল মেন্টের চাঁচল-৭০ অপর পাশে সিঙ্গিয়া-৬৮ নং মৌজা দুটি এই মরা মহানন্দা নদীটির সীমাদ্বারা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আজকে যেখানে নজরুল বাস টার্মিনাস দাড়িয়ে আছে নদীর উল্টোদিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে যেখানে ভবেশ বাবুর গুল ফ্যাক্টরী টি অবস্থিত নক্সাটির (চাঁচল ৭০, সিট নং ২) গায়ে দেখা যায় লেখা আছে ডুমরাইল ফেরীঘাট। এটিকে চাঁচল ফেরীঘাট না বলে ডুমরাইল ফেরীঘাট বলার কারন হল এক সময় খরবার পুরাতন বানিজ্য ভুমি (একসময় ডুমরাইল কলিগ্রামের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্য চলত) একথা লেসবোর্ন সূত্রেও জানা যায়। ডুমরাইল গ্রামটি কলিগ্রামের মতই প্রাচীন গ্রাম এতে কোন সন্দেহ নেই। এই ডুমরাইল গ্রাম থেকেই প্রতি বুধবার হাটে (চাঁচলের প্রাচীন হাট আগে চাঁচল বাজার, বারোয়ারী দুর্গা মন্ডপের সামনে এবং চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেলের দুই ধারে পাটহাটি গরুহাটি এখনও নামকরন হয়ে আছে) নিয়মিত ভাবে ৪০/৫০ টি ডিঙ্গি ও বড় বড় নৌকা করে হাটে কেনা বেচা করতে আসতো। (পাঠকদের সুবিধার জন্য পাশে নক্সাটি দেওয়া হল) নক্সাটিতে দেখা যাচ্ছে চাঁচল রাজ হিন্দু হোষ্টেল (একদা চাঁচল রাজবাটি/Old Raj Palace) বা B.S.N.L. Tower থেকে সুকান্ত মোড় বাজার দিয়ে (নেতাজী সুভাষ রোড) সোজা কোন বাঁক নেই পথটি বর্তমান নজরুল বাস টার্মিনাসের কাছে যে পাকা মার্কেটটি হয়েছে সেখান পর্যন্ত সোজা দেখা যায় অর্থাৎ বহু পূর্বে উপেন্দ্রনাথ তালুকদার বা ফটিক চৌধুরীর বাড়ি এসব কিছুই ছিল না। পরবর্তী কালে ডালমিয়ার দোকানের নিকটে যে ব্রীজ (সেঁতু) টি নির্মিত হলে বাবুলাল সাহার বাড়ি (পূর্বে মিষ্টির দোকান) এবং চৌথ মল সেকসেরিয়ার বাড়ির নিকট থেকে পথটি টার্ন নিয়ে এখন বাসস্ট্যান্ডের সাথে

মিলিত হয়েছে। ১৯০৪ সালে রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী নতুন রাজবাড়ীতে প্রবেশ করলে চাঁচল মৌজার সঙ্গে সিঙ্গিয়া মৌজার যোগাযোগের জন্য ইংরেজ বাহাদুরের সহযোগিতায় এই সেঁতুটি তৈরী হয়েছিল। বাবা দাদুদের মুখেও শুনেছি তাঁরা এই 'ফেরীঘাট' পার হয়ে বর্তমান ব্লক রোড হয়ে বাসুদেব পাড়া দিয়ে ভারতীনগরের পাশ দিয়ে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের উত্তর দিকের দরজা বা গেট দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করতেন। এই ডুমরাইল ফেরীঘাট বা চাঁচল ফেরীঘাটে নদী পারাপারের জন্য একজন ঘাটুয়াল/ঘাটোয়াল বা মাঝি রেখেছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। দুই পাড়ের প্রজাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য জমিদার বাবু ঘাটোয়ালের পরিবার পালনের জন্য সুজাগঞ্জ মাঠে বেশ কিছু জমি/ঘাটোত্তর জমি, (দেবতার জন্য দেবোত্তর, পীড়দের জন্য পীরোত্তর জমি পূর্বে আলোচিত হয়েছে) দিয়েছিলেন। এই ঘাটোয়ালের পৌত্র বা তার বংশধররা এখন ও চাঁচল ধুনিয়াপট্টিতে বসবাস করছে। সুজাগঞ্জের ঘাটে গেলে এখন ও শোনা যায় ঐ জমি গুলি ঘাটুয়ালের জমি বলে পরিচিত হয়ে আছে।

যা হোক উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিক থেকেই পলি পরতে পরতে নদী খাতটি মজে যেতে থাকে এবং গভীরতাও কমতে থাকে ফলে বর্ষাকাল ছাড়া বা বন্যার সময় ছাড়া নদীটির গতি পথের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মালদা জেলাকে গঙ্গা ভাগিরথী, ফুলোহর ও মহানন্দার প্রবল বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য রিং বাঁধ বেঁধেছিল যাকে আমরা মহানন্দা মাষ্টার প্ল্যান বলে থাকি। নদীবক্ষ শুকিয়ে গেলেই চলতে থাকে চাষ আবাদ ফলে নদীটির নাব্যতা হ্রাস পায়। সম্প্রতি মালদা জেলা পরিষদ নজরুল বাস টার্মিনাস নির্মান কালে মরা মহানন্দার ওপর ঢালাই নালা পথ দিয়ে জলনিকাসী ব্যবস্থা করে ওপর দিয়ে পথ (রোড) করেছে। উত্তর বঙ্গ উন্নয়নের টাকায় তৈরী হয়েছে চাঁচলে পাঁকা ড্রেন কিন্তু মরা মহানন্দাকে না খোরা হলে সারা চাঁচলের জল নিকাসী ব্যবস্থা বিপন্ন হবে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের যে সকল ব্যক্তি আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের কাছে ঋণী। এই মহানন্দা নদীর জলেই একদা রাজবাড়ীর কূলবধূ আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন এবং পাহাড়পুরের সতীঘাটে তার দেহ ভেসে উঠেছিল

বলে তার নাম সতীঘাটা শ্মশান নাম করন হয়েছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন ইতিহাস হীন জাতির দুঃখ অসীম তিনি আরও বলেছেন "বাঙালার ইতিহাস চাই বাঙালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না।" সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের ভূগোল ও ইতিহাস বিভাগের কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন চাঁচলে একটি মিউজিয়াম করা হোক। সকলের ইচ্ছা ও সহযোগিতা পেলে এবং সরকার পক্ষের সহযোগিতায় গড়ে উঠুক চাঁচল মিউজিয়াম। চাঁচল থানার যত্র-তত্র পড়ে রয়েছে বহু পুরা নিদর্শন ও ভাস্কর্য্য শিল্প কীর্ত্তি জায়গা হোক তাদের একটি মিউজিয়ামে। আমি একজন রোটারিয়ান হিসাবে চাঁচলের রোটারিয়ান দাদা বন্ধু ও ভাইদের অনুরোধ করবো সহৃদয় সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য।

<u>তথ্য সূত্র</u>

★ মালদা জেলা ইতিহাস ও জেলা সমগ্র- আব্দুস সামাদ

★ M.O. Carter's- Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Malda

★ মালদা জেলার নদ-নদী- আব্দুস সামাদ

<u>ব্যক্তিঋণ</u>

১) নন্দ দুলাল রাম- ভূমি সংস্কার দপ্তর

২) রতন কর্মকার-ঐ

৩) দিলিপ কুমার সাহা-ঐ

হাতিন্ডা মন্দির

হাতিন্ডা মন্দিরের কথা

The statistical Account of Bengal এর এক রিপোর্টে জানা যায় হাতিন্ডা/ হাতান্ডা (HATANDA) নামে একটি বিশাল পরগনা চাঁচল রাজ ষ্টেটের অধীনে ছিল। ১৮৫২ সালে হাতিন্ডা পরগনার আয়তন ৩২৩৯ একর জমি এবং ১৮৭৬ সাল নাগাদ এই পরগনায় আবাদি জমির পরিমান ছিল প্রায় ২৯১২ একর জমি। (The statistical Account of Maldah- By w.w. Hunter - 1876 Page-82) যা হোক এই পরগনা স্থিত হাতিন্ডা গ্রামের পাশেই ফাকা মাঠের মধ্যে তৈরী হয়েছে এই শিব মন্দির। আজ থেকে প্রায় ৭২ বছর আগে মকদম পুর গ্রামের দুই সহোদর ভ্রাতা তথা ধর্ম প্রান ব্যক্তি স্বর্গীয় রাধানাথ সাহা ও স্বর্গীয় লক্ষন সাহার স্মৃতি রক্ষার্থে তদীয় পুত্রগণ (১) শ্রী চন্দ্র মোহন সাহা (২) শ্রী সুরেন্দ্র নাথ সাহা (৩) শ্রী ননী গোপাল সাহা (৪) শ্রী গিরি গোবর্ধন সাহা এবং (৫) নিত্যানন্দ সাহা কর্তৃক বাংলা ১৩৪৩ সালের ১৩ই ফাল্গুন মাসে এই শিবমন্দিরটি নির্মান করেন। বিগত ২০ বছর ধরে এই মন্দিরের পূজা আর্চা ও দেখাশোনা করছেন লাল সাধু শ্রী চন্দ্রভূষন পান্ডে ও তৎপুত্র সুভাষ পান্ডে। এই

সাধু বাবার একান্ত চেষ্টায় পাশের ৮ কাঠা পরিমিত আমবাগান টি এবং ১০ কাঠা জমি ও খরিদ করেছেন মন্দিরের নামে। সম্প্রতি এই শিব মন্দিরের পাশেই জন সাধারনের চাঁদার টাকায় এবং এই সাধুবাবা তথা মন্দিরের পূজারীর চেষ্টায় নির্মিত হয়েছে বিশাল পার্বতী মন্দির। মন্দিরটি লম্বায় প্রায় ২৫/৩০ ফুট এবং মন্দির গাত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর কারুকার্য্য রয়েছে। প্রতি বছর শিবরাত্রির দিন অর্থাৎ শিব চতুরদশীতে এই মন্দির প্রাঙ্গনে বসে মেলা। চাঁচল, সিহিপুর, হাতিন্ডা, রাজনগর, দেবীগঞ্জ, মকদমপুর প্রভৃতি গ্রামের শিব ভক্তরা এবং গঙ্গা ঘাট থেকে জল নিয়ে আসা বহু ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে এই মেলার দিন।

এই মেলা প্রাঙ্গন এবং মন্দিরটির পাশেই নির্মিত হয়েছে "হাতিন্ডা শিবির মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র' ২০০১ সালে। ২০০৩-২০০৮ সময় কালে চাঁচল-১ নং ব্লকের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ইন্তাজ হোসেন (বর্তমান সভাপতি - চাঁচল ১ পঃ সমিতি) বাবুর একান্ত চেষ্টায় পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এই মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে। হাতিন্ডায় বিদ্যালয়টি চালু হয়েছে। হাতিন্ডায় বিদ্যালয়টি চালু হয়েছে বলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম গঞ্জের বহু ছেলেমেয়ে এখানে এসে লেখাপড়া করতে পারছে। শিক্ষার বিস্তার হলে জাতী একদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে দুরে ফেলে জ্ঞানের আলোক খুজে পাবে। গ্রাম গঞ্জের মধ্যে এইভাবে শিক্ষা বিস্তারে ইন্তাজ বাবুর ভূমিকার জন্য আমরা তাহার ভূয়সী প্রসংসা করছি।

মালদা জেলা সমবায় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

চাঁচল রাজ কো-অপারেটিভ এর আত্মকথা

এলাকার দানবীর জমিদার তথা এলাকার দানবীর রাজা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন জনহিত কার্যাবলীর জন্য ১৯১২ সালে ইংরেজ বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। আজ থেকে প্রায় ৮০/৮৫ বছর আগে রাজা শরৎচন্দ্র এবং শিশির কুমার মুখার্জীর মিলিত প্রচেষ্টায় প্রজাদের চরা সুদের হাত থেকে রেহাই পেতেই প্রতিষ্ঠা করেন (১) চাঁচল রাজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (২) হরিশ্চন্দ্রপুর রাজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক দুটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহাজনদের চরা সুদের হাত থেকে প্রজারা যাতে আর্থিক সুবিধা পায় এবং বিশেষতঃ চাষ-বাসের কাজে চাষীরা উপকৃত হয়। ১৯৪০ সালের রাজ্য সরকারের কো-অপারেটিভ সোসাইটির আইনমূলে এটি আর্থিক লেনদেন করবার অনুমোদন পায়। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসের এক রিপোর্টে জানা যায় There is a branch of the state Bank at Malda. In adition there is a central co-operative Bank, which has two Branches, one at chanchal and the other at Harish chandrapur. (Malda District Gazeter - J.C. Sengupta 1969 page-129) চাঁচলে আরও চার পাঁচটি ব্যাঙ্ক থাকলেও

মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কটির ই কেবল নিজস্ব জমি ও বিল্ডিং আছে। কাজকর্মের অকুলান হওয়ার জন্য সম্প্রতি ব্যাঙ্ক টি পেছনের দিকে ঘরের যায়গা বাড়িয়ে বড় করা হয়েছে এবং পুরো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। ১৭ই জানুয়ারী ২০০৬ সালে চাঁচল কলেজের অধ্যাপক মহাশয় শ্রী শান্তনু কুমার বসুর দেওয়া আনন্দ বাজার পত্রিকায় এক রিপোর্টে জানা যায় মালদা জেলার প্রায় সবকটি শাখা মিলিতভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে প্রায় ১ কোটি টাকা ঋন পরিশোধ ও হয়েছে। কিছুদিন আগেও আনন্দ বাজার পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল মালদা জেলায় ঋনদান এবং পরিশোধ এর খাতায় মালদা জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জন্ম লগ্ন থেকে আরম্ভ করে বহুদিন বাবদ চাঁচল রাজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নাম ছিল কিছুদিন আগে রাজ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। চাকুরী জীবিদের এমপ্লয়িজ ক্রেডিট সোসাইটি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠিগুলির লোনের চাহিদা ও পরিশোধ করবার অর্থাৎ ঋন আদায় ঠিক-ঠিক হওয়ার জন্য এবং প্রচুর পরিমান সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকলেও চাঁচল সমবায় ব্যাঙ্কটির কর্মী গ্রাহক দের সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিষেবা দিয়ে আসছে তাহা নিশ্চয় প্রসংসার যোগ্য।

তথ্য সুত্র

☆ আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৭ই জানুয়ারী ২০০৬

☆ Malda District Gazeteer- by J.C. Sengupta (1969)

আমার ব্যক্তিঋণ

১) শান্তনু কুমার বসু- অধ্যাপক চাঁচল কলেজ

২) ম্যানেজার বাবু এবং ব্যাঙ্কের কর্মীবৃন্দ।
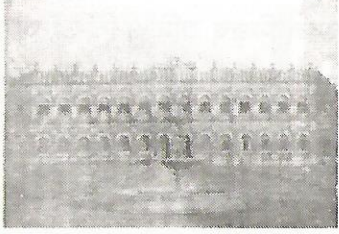
আমি রাজ বাড়ি

আমি ছিলাম রাজবাড়ী শরৎচন্দ্রের নামে,
আমায় ছেড়ে গেলে তুমি কোলকাতা ধামে।
ম্যানেজার এলেন কত চাঁচল রাজষ্টেটে,
বিলাশ ব্যসনে সব গেলেন যে মেতে।
তোমার অন্য জামাতা আর দৌহিত্রগন,
উড়ে এসে জুড়ে বসল প্রাসাদে তখন।
তোমার দানে ধন্য হলো মালদা জেলাবাসী,
পুত্রবধূ মুক্তকেশী চলে গেলেন কাশি।
তোমার জন্য জীবিত কালে- ষ্টেট হলো ছয় ভাগ,
সব কিছু কে তুমি করেছ যে ত্যাগ।
সবকিছুর সাক্ষ বহন করে চলেছি যে আমি,
অ-স্থাবর হয়ে আছি নেই শুধু তুমি।
শতবর্ষ প্রাচীন আমি হয়ে গেছি বৃদ্ধ,
লেখাপড়ার সুবাদে যদি হই আমি শুদ্ধ।
রাজবাড়ীর একাংশে হয়েছে যে কলেজ,
ছাত্র-ছাত্রীদের এতে বাড়বে কত নলেজ।
অন্যধারে রামসীতার আছে এক মন্দির,
মুসলিম ভাইয়েরা আসে (মহরমে) মৈত্রী ও সন্ধির।
কালের কবলে আমি বৃদ্ধ রাজবাড়ী,
চীর সাক্ষী হয়ে আছি আমি রাজবাড়ী।

— মেঘনাদ দাস

চাঁচল অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র, পাহাড়পুর চাঁচল

"চাঁচল অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের কথা"

চাঁচল বাসীর দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ১লা এপ্রিল, ২০০১ সাল থেকে মালদা জেলার দ্বিতীয় সাব ডিভিশন হিসেবে "চাঁচল সাব ডিভিশন হিসেবে "চাঁচল সাব ডিভিশন"- আরম্ভ হয়। তারপর ধীর গতিতে হলেও শুরু হয় সাব ডিভিশনাল যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম। তারই ফলশ্রুতিতে ২৪ শে আগষ্ট, ২০০২ সালে পাহাড় পুর মৌজায় (১৪৯) প্রায় ২.৫ বিঘা জমির উপরে এ পর্যন্ত তিন ধাপে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছে "চাঁচল অগ্নি নির্বাপন" কেন্দ্র অফিস সহ ষ্টাফদের ভবনটি। এই ভবনটির উদ্বোধন করতে আসেন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক বা অফিসার-ইন্-চার্জ শ্রী শ্যামল কুমার বোস বাবুর কাছ তেকে জানতে পারলাম বর্তমানে এই সাব ষ্টেশনটি Single Pump বা ওয়ান পাম্প ফ্যাসালিটি আছে। যেখানে উপযুক্ত কর্মী লাগে ৩৬ জন কিন্তু বর্তমানে ১৫ জন কর্মীকে নিয়ে

শ্যমলবাবু কাজ চালাচ্ছেন। তিনি আরও জানালেন যে খুব শ্রীঘ্রই এই One Pump Station টি ২ পাম্প বা Double Pump Station এ পরিনত হবে। এটি নিশ্চয় আমাদের কাছে খুব খুশির খবর।

বিভিন্ন পূজা পার্বনে প্যান্ডেলের পরিমাপ অনুযায়ী ২৫০ টাকা থেকে ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা) পর্যন্ত Govt. এর 7 no. T.R. form এ চাঁচল ট্রেজারী অফিসে টাকা জমা দিয়ে অগ্নি নির্বাপনের সুযোগ পাওয়া যায়। এই ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনটির ফোন নম্বর হলো ২৫২১০১ চাঁচল এবং টোল ফ্রি-নম্বর টি হল ১০১ তবে সরাসরি টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করলে মালদা বা বালুর ঘাট ধরবে। সেই জন্য গ্রাহক বা চাঁচল বাসীদের ২৫২১০১ নম্বরে ফোন করাই ভাল। শ্যামল বাবু এবং সাব ষ্টেশনের ষ্টাফ্‌দের সাথে আলাপ করে খুব ভাল লাগল এবং তাদের সহযোগিতা ও ব্যবহারে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি।

কুমার শিবপদ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট

শিবপদ লাইব্রেরীর কথা

রাজ শরৎচন্দ্র পর্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে ১৯২৫ সালে রাজাবাবুর একমাত্র পুত্র কুমার শিবপদ-র অকাল মৃত্যুতে রাজা যৎপর নাস্তি মানসিক ও শারীরিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এই সময় রাজার শেষ বংশধর এর নামানুসারে তৈরী হয় কুমার শিবপদ হোমিও প্যাথি চিকিৎসালয় এবং এই পাঠাগারটি প্রায় ৫/৬ বিঘা জমির উপর তৈরী হয়েছিল "কুমার শিবপদ মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউট" এবং এই পাঠাগারের লাগোয়া পশ্চিম পাশে তৈরী হয়েছিল নাটক তথা সংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে একটি বিশাল হলঘর ষ্টেজ সহ যেটি বর্তমানে পুষ্প সিনেমা হল নামে পরিচিত। বর্তমান লাইব্রেরীয়ান শ্রীমতি মধুমিতা ঘোষ এবং মানিক চন্দ্র দাস (J.L.A.) এর সাথে কথা বলে জানা গেল যে বর্তমান সিনেমা হলটি থেকে ভাড়া হিসাবে প্রতিমাসে প্রায় চার হাজার (৪০০০) টাকা পেয়ে থাকেন। বিগত ১৯৩৭ সালে তৈরী হয়েছিল এই পাঠাগারটি। লাইব্রেরী মাঠের সামনে অর্থাৎ পূর্ব দিকে এবং দক্ষিনদিকে রোড সাইডে তৈরী হয়েছে প্রায় ২৫/৩০টি দোকানঘর শরৎচন্দ্র বিপনন বীথিকা নামে। এই পাঠাগারটির বর্তমান সম্পাদক শ্রী বিপ্লব

কুমার সরকার এবং সভাপতি শ্রী ইন্দ্র নারায়ন মজুমদার মহাশয়ের কাছ, থেকে জানা গেল এখানে প্রায় ৩৮১০ টি বই আছে যেখান থেকে সদস্যদের নামে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পড়বার জন্য দেওয়া হয়। লাইব্রেরীয়ান মধুমিতাদি আরো জানালেন ১৯৪৬ রাজা শরৎ চন্দ্র মারা গেলে প্রায় ৫০০০ বই সম্বলিত দুঃষ্প্রাপ্য পুস্তক ভান্ডার দিয়ে গেছেন। এই বই গুলি আগ্রহী পাঠক ও গবেষক দের পাঠাগারে বসে পড়তে দেওয়া হয়। বড়ঘরটিতে একসাথে ২৫/৩০ জন পাঠক বসে পড়বার জন্য রয়েছে রিডিং রুম এবং টেবিল টেনিস খেলা ও কয়েকটি ক্যারাম বোর্ডও রয়েছে খেলার জন্য। সামনের মাঠে আগে ভলিবল খেলা হত কিন্তু এখন প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। বিগত ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে এলাকার প্রয়াত বিধায়ক মহবুবুল হক্ সাহেবের উন্নয়ন তহবিলের টাকায় গড়ে উঠেছে লাইব্রেরীর একাংশে কুমার শিবপদ শিশু উদ্যান। ছোট ছোট শিশুদের জন্য গড়ে ওঠা এই শিশু উদ্যানে রয়েছে শিশুদের উপযোগী কয়েকটি খেলনা কিন্তু উদ্যানটি বর্তমানে পরিচর্চার অভাবে শিশুদের খেলা ধূলার অনুপযোগী হয়ে আছে। এই লাইব্রেরীটি একেবারে শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে (Heart of the town) অবস্থিত হওয়ার জন্য সামনের ফাঁকা মাঠটির গুরুত্ব চাঁচলের সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের কাছে অপরিসীম। এই মাঠেই এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বইমেলা, শিবরাম মেলা এবং অন্যান্ন ছোট-ছোট অনুষ্ঠানাদি। সিনেমা হল মালিক এবং শরৎ চন্দ্র বিপনন বীথিকার সকল ব্যবসায়ী বৃন্দ যদি তাদের ভাড়ার অর্থ ঠিকঠাক প্রদান করেন তা হলে এই বিশাল পরিমান অর্থের বিনিময়ে পাঠাগারটির রাজকীয় ঐতিহ্য নিশ্চয় খুব ভালোভাবে রক্ষা পাবে। তার সঙ্গে চাই পাঠক সমাজ ও চাঁচলের সংস্কৃতিক প্রেমী মানুষের একান্ত সহযোগিতা তাহলে হয়তো এলাকার দানবীর রাজা শরৎচন্দ্রের মহান কীর্তি টিকে আমরা টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হব।

চাঁচল কলেজ

চাঁচল কলেজের কথা

চাঁচলে শিক্ষার হাল ধরতে জমিদার ঈশ্বরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রায় পাড়ায় স্থাপিত হয়েছিল সংস্কৃত টোল বা চতুষ্পাঠি । পরবর্তীকালে রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ও রাণীমা সিদ্ধেশ্বরী দেবী এবং কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস মিঃ এইচ.আর.র‍্যালি সাহেব চাঁচলকে শিক্ষার জগতে নিয়ে যেতে সর্বতো ভাবে সহযোগিতা করেছেন-একথা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। ১৮৭০-৭২ সালের দিক থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় চাঁচল ইংরাজি স্কুল এবং পরবর্তীকালে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়। ১৮৮৮ সালের ১৬ই আগষ্ট রাণীমার জন্ম দিনটিকে চিরস্মরণীয় আর বরনীয় করতে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়কে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন নতুন নামে। আগে যাহা ইংরাজী স্কুল ছিল পরে তাহা সিদ্ধেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন নামে পরিচিত হল। ১৮৮৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দেবীচরন অধিকারী ও শশীভূষন ভট্টাচার্য মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। চাঁচল রাজ স্টেটের আর্থিক

সহযোগীতায় এবং রাজা শরৎ চন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় স্কুলটি খুব ভালোভাবে চলতে থাকে। কিন্তু চাঁচলের যে মহান ব্যক্তিটি চাঁচলের উচ্চ শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন সেই সুভানুধ্যয়ী মানুষটি হলেন কামাখ্যা চরণ নাগ। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক এই কামাখ্যা চরণ নাগকে রাজা শরৎচন্দ্র মাসিক দুইশত টাকা বেতনে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯১৪-১৯১৮ সাল অবধি প্রায় পাঁচ বছর কাল কামাখ্যা বাবু সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে বেশ কয়েকজন কৃতি ছাত্রের জন্ম দেন। তিনিই সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন চাঁচলে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে একটি কলেজ হওয়া দরকার। সেই কথা ভেবে কামাখ্যা বাবুই সর্বপ্রথম রাজদরবারে সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নিত করার আবেদন করেন। কিন্তু এখানেই বাধ সাধলেন ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু ও আল্লারা। রাজাবাবুর মতামত থাকলেও ম্যনেজার বাবুর সাথে কামাখ্যাবাবুর মতের অমিল দেখা দেওয়ার ফলে একরকম মনের দুঃখে সিদ্ধেশ্বরী স্কুল ছেড়ে নিজগৃহে চলে যান।

১৯১৮ সালের কামাখ্যাবাবুর মনের ইচ্ছা বাস্তবে রূপদান পেল ১৯৬৯ সালের ২৬শে আগষ্ট দিনটিতে। এ.বি.এ. গনিখান চৌধুরী, ড. গোলাম ইয়াজদানী, ডা কুলদা কান্তি সরকার, ডাঃ রামরঞ্জন লাহিড়ী, অক্ষয় মুখার্জী, রাম রাঘব লাহিড়ী, সুধীর কুমার চক্রবর্তী, বড়দা কান্ত সরকার, জ্ঞানেন্দ্র নাথ সরকার, শিব সন্তেষ চক্রবর্তী, অনিক কুমার মজুমদার, নারায়ণ প্রসাদ রাম, মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালা, হরিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও মহবুবুল হক প্রভৃতি সুভানুধ্যয়ি ব্যক্তিদের একান্ত অনুপ্রেরনায় এবং একান্ত আর্থিক সহযোগিতায় পাঞ্চালি মাঠে প্রায় ৭/৮ বিঘা জমি খরিদ করে চাটাই ও টিনের চালা ঘরে এই মহাবিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ডঃ গোলাম ইয়াজদানির একান্ত চেষ্টায় চাঁচল বাসির দরজায় দরজায় ঘুরে চাঁদা তুলে কলেজের নামে জমিটি খরিদ করা হয়। এই চাটাই গৃহ পঁচে গেলে কিছুদিন সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ে মর্নিং সেশনে এবং পরবর্তীকালে রাজা শরৎ চন্দ্রের সুযোগ্য দোহিত্র শ্রী শিশির কুমার মুখার্জীর দানে চাঁচল রাজবাড়ীর দক্ষিণ অংশে তার নিজের ভাগের বাগান ও ঘরগুলি যেখানে পূর্বে রাষ্ট্রীয় নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষন কলেজ বা Jr. B.T. College ছিল সেখানেই বর্তমান কলেজটি ১৯৭২-১৯৭৩ সাল থেকে অদ্যাবধি চলছে। এই কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল শ্রি

শঙ্কর কুমার সরকার, অধ্যাপক শ্রী সান্তনু বাসু ও সিরাজুল হক সাহেব এবং কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চন্দ্র দাস-এর সাথে কথা বলে এবং ২০০৮-০৯ সালের কলেজ মেগাজিন "সম্প্রীতি" নামে বার্ষিক পত্রিকাটি পরে জানতে পারলাম তা হল ১৯৬৭ সাল থেকে কেবল কলা বিভাগ চালু ছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৮৩ সাল থেকে এটি কমার্স বা বি.কম পড়ানোর অনুমোদন পায়। বিগত পাচ ছয় বছর যাবদ এখানে বিজ্ঞান বিভাগটিও পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে এই কলেজে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী, ইতিহাস, ফিলোজফী, অর্থনীতি, ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স চালু হয়েছে। এছাড়াও এই কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের অঙ্ক এবং বানিজ্য বিভাগের হিসাব শাস্ত্র বিষয়দুটিতে অনার্স পড়ানো হয়। চাঁচল মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে ২০ জন স্থায়ী অধ্যাপক ৯ জন আংশিক সময়ের অধ্যাপক এবং ১৭ জন অশিক্ষক কর্মচারী আছেন। এই কলেজটি উত্তর মালদার দ্বিতীয় কলেজ অর্থাৎ সামসী কলেজের পড়েই এবং মালদা জেলার তৃতীয় কলেজ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

যা হোক বিগত কয়েক বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চাঁচল কলেজে এস.এফ.আই ও সি.পি. এর মধ্যে সংসদ দখলকে কেন্দ্র করে যেভাবে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও সংঘর্ষ চলছে তা আমরা চাঁচল বাসি প্রত্যক্ষ করেছি। পাশেই রয়েছে এস.ডি.ও. চাঁচল মহকুমা অফিস এবং সিদ্ধেশ্বরী প্রাইমারী ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। নির্বাচনের দিনে এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গন তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সেই দিন পঠন পাঠন বন্ধ রাখতে বাদ্ধ হয়ে থাকেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না। আমরা চাঁচল বাসী অভিভাবক গন ভয় পেয়ে যায় ছেলেমেয়েকে কলেজে পাঠাতে। সরকার পক্ষ র‍্যাপ বাহিনী নামাতে বাধ্য হন এই নির্বাচনের দিন। দলমত নির্বিশেষে চাঁচলের সব রাজনৈতিক দল, নেতা, সুধী অভিভাবক বৃন্দকে এর সুষ্ঠু সমাধানের কথা ভাবতে হবে। খুব ভালো খবর হল চাঁচল কলেজের একাংশে খুলেছে নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং স্টাডি সেন্টার যেখানে নিয়মিত ভাবে না গিয়েই বাড়ীতে বসেই বিয়ে পাশ এবং এম.এ. পাশ করে নেওয়া যায়।
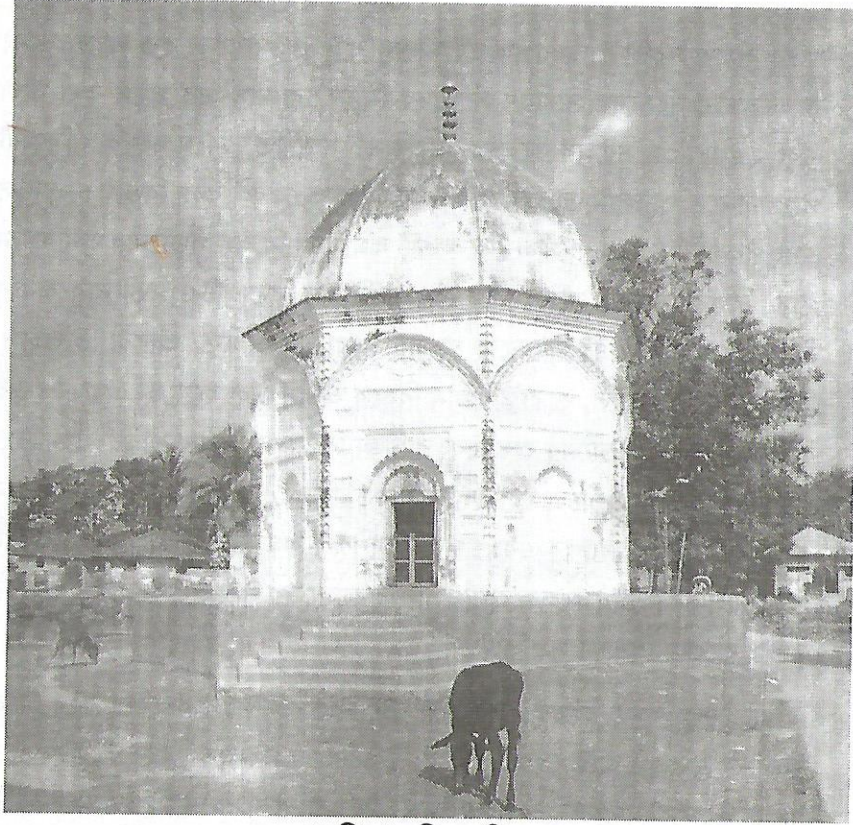
কলিগ্রাম শিব মন্দির

কলিগ্রামের কথা

কবি শিবরামের ভাষাতেই বলি - "চাচোরের কাছাকাছি নাম ডাকওয়ালা এক গ্রাম ছিল বেশ বর্ধিষ্ণু কলিগ্রাম" চাঁচল থেকে বা এমদা চাচোর থেকে পাকা সড়ক পথে একটি ছোট পুল (সেঁতু) পেরিয়ে প্রায় দুই কিমি পথ এই কলিগ্রাম। কলিগ্রাম মালদা জেলার যেমন এক নামকরা গ্রাম তেমনি কলিগ্রামের বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রী কৃষ্ণ চরন সরকার, রাম রাঘব লাহিড়ী ইত্যাদি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিগত মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকে গ্রামটির সাংস্কৃতি, জনসংখ্যা ও শিক্ষা দীক্ষায় ইংরেজ বাজারের সঙ্গে কলিগ্রামকে অনেক লেখকই তুলনা করেছেন। লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে কলিগ্রামের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য এ কথা

অনস্বীকার্য। মালদার সু- সন্তান বিনয় কুমার সরকারের অনুপ্রেরনায় কলিগ্রামে কৃষ্ণচরণ সরকার লাখিরাজ বা নিস্কর জমি দখল করেন জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য। এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রী রামনিধি মজুমদার, জগবন্ধু সরকার, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, রামচন্দ্র লাহিড়ী, মদন গোপাল রায় চৌধুরী, কৃষ্ণ বিনোদ গোস্বামী ও গিরিন্দ্র নারায়ন বিশ্বাস প্রভৃতি যুবকেরা কলেজের লেখা পড়া ছেলে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। রাম রাঘব লাহিড়ীর নেতৃত্বে এলাকায় রামপন্থী আন্দোলন বিশেষ রূপ পায়।

পূর্ণিয়ার সাউরিয়া জমিদারীর বিস্তৃত জমিদারী রুক্ষনপুর পরগনার মধ্যে একটি মৌজা, রানী ইরাবতী এক ব্রত উদ্‌যাপন করে ১২টি জায়গায় ১২টি পুকুর ও ১২টি শিব মন্দির শাস্ত্রানুযায়ী প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এই সময় কলিগ্রামে ও রানিদিঘী নামে একটি পুকুর খনন করেন এবং তার ঘাটের পাশে একটি বিশালাকার শিবমন্দির নির্মান করেন। কলিগ্রামের ভক্তবৃন্দরা আজও ঐ পুকুরের জল ও বেলপাতা ঐ মন্দিরে পূজা করে থাকেন। মন্দিরের ভিতরের গম্বুজটি গোলাকার, বাইরের প্রতি বাহুতে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বের দুটি কুলুন্দী আছে। গোম্বুজের ভূমির অবস্থান পর্যন্ত প্রায় কুড়ি ফিট (২০) মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে উপরে চুন-সুরকির গনেশ মূর্ত্তি বিদ্যমান।

কলিগ্রামের গোস্বামী পরিবারে অনেক জ্ঞানী-গুনি ও পণ্ডিত ব্যক্তির জন্ম হয়। এই শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি গনের প্রচেষ্ঠায় "ন্যায়রত্ন চতুষ্পাঠী" নামে একটি সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠা করেন। একদা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও এই টোলের ছাত্র ছিলেন। এই টোলের সুনাম জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে বহু দুরদুর থেকে ছাত্ররা এসে এখানে লেকাপড়া করতো। স্থানীয় শ্রী সুশীল কুমার লাহিড়ী কাব্যতীর্থ এই টোলের শেষ ছাত্র ছিলেন।

চাঁচল রাজ ষ্টেটে ইউরোপিয় সাহেবরা মাঝে-মাঝেই আসতেন। রাম রাঘব লাহিড়ী, রাম প্রফুল্ল লাহিড়ী, কৃষ্ণচরণ সরকার, জগবন্ধু সর - এর রয়স তখন যুবক প্রায়। তাদের শরীরে স্বাধীনতার মন্ত্রে রক্ত টক্‌বগ্ করে ফুটছে। হঠাৎ তাহারা লোক মুখে জানতে পারলেন যে কয়েকজন ইংরেজ সামসি ষ্টেশনে নেমে ঘোড়াগাড়ি চেপে চাঁচলে রাজবাড়ীতে আসছে। তাহারা গোপনে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের সুইমিং পুলের নিকট গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ছিলেন। ইউরোপিয়ান

সাহেবদের গাড়িটি সেখানে আসতেই তাহারা চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজদের উপরে। এবং প্রচণ্ড হারে মারধর করে সাহেবদের রক্তারক্তি করে পালিয়ে যান সকলে /জনশ্রুতি থেকে । যেহেতু রাজা শরৎচন্দ্র ইংরেজদের প্রভুভক্ত ছিলেন পরে বিপদ ঘটে এই ভেবে কলিগ্রামের যুবকরা ১ মাস কাল বাড়ি ছেরে পালিয়ে বাচেন। সংস্কৃতি প্রেমী কলিগ্রামের মানুষ একসময় গম্ভীরা গান এবং গ্রামে ও এলাকায় বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। ১৩২১ সালে শ্রী শরৎ দাস চাঁচলের দানবীর রাজা শরৎচন্দ্র রায় চৌধূরী সম্পর্কে গেয়েছেন—

চাঁচলের দানবীর রাজা বাহাদুর,
করেছেন কত দেশের অভাব দূর
ন-ঘরিয়া এন্টান্স স্কুলে অর্থ দিয়েছেন প্রচুর
আবার হিন্দু মুসলমান পায় রাজার দান
করছেন তিনি প্রজার রঞ্জন।

কলিগ্রামের বিখ্যান পত্রিকা 'গম্ভীরা' এবং তার সম্পর্কে শরৎ বাবুর গান এই রকম —

কলিগ্রামের কৃষ্ণচরন সরকার
আমরা বলব কি গুন তার
গম্ভীরা পত্রিকা তিনি করেছেন প্রচার
গম্ভীরাতে নাগানতে দেশের করবে অভাব মোচন।

বুকানন হ্যামিলটনের এক রিপোর্টে জানা যায় যে এখানে সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো ভাবে তৈরী হয়েছিল ৭০০ শত পাকাবাড়ি, কিছু কিছু ছোট ইটের বাড়ি এখনও অলিগোলিতে দেখা যায়। এখানের কাঁসারী পট্টিতে তৈরী হত সুন্দর সুন্দর কাঁসার বাসন এবং সূতী বস্ত্র শিল্পে অর্থাৎ কুটীর শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। এখানে তৈরী সূতীবস্ত্র, মসারী ও চাদর খুব বিখ্যাত ছিল।

বুকানন বলেছেন - Kaliganj (Kaligaou / Kaligaon) Where the court for trying petty suits has been placed, is the chief town in the division and contains about 700 houses. Compatly

fuilt. Besides a sabordinate factory belonging to the company, it contains several good bricks houses, and it Celebrated for manufactures of cotton cloth called khasas.লোকমুখে এখনও শোনা যায় কলিগ্রামের গোলি, হরচনপুরের হোলি আর পাহাড়পুরের বলি - চাঁচল রাজবাড়ীর চণ্ডিদেবীর পূজা মণ্ডপে পাহাড়পুরে একসময় প্রচুর পরিমানে পাঠাবলি হোত বলেই এইরকম প্রবাদবাক্য লোকমুখে শোনা যায়। আমার মনে হয় এই প্রবাদ বাক্য কিছুটা পরিবর্তন করে।

কলিগ্রামের গোলি
হরিশ্চন্দ্রপুরের হোলি
আর গোবরজনার বলি

দিনাজপুরের বোল্লা কালীকে বাদ দিলে মালদা জেলায় রতুয়া থানার গোবর জন্নায় ১৫০০ -২০০০ পাঠা বলি প্রতিবছর হয়ে থাকে। কলিগ্রামে প্রচুর পরিমানে তিলি সম্প্রদায়ের বসবাস কলিগ্রামের সঙ্গে জগন্নাথপুর ও চুরামনের পারিবারিক, বৈবাহিক আত্মিয়তা খুব বেশি পরিমানে দেখা যায় - একসময় ডুমরাইলের সঙ্গে ব্যবসা-বানিজ্যের যোগাযোগ ছিল। তাইতো বিভিন্ন লোক মুখে শোনা যায়- ''চর-চুরামন কলিগাঁও, বেটি না পেলে জগন্নাথ পুর যাও''— অন্য কোথাও বিবাহ যোগ্য বধূ না পেলে জগন্নাথপুর বা চুরামন গেলে বেটি পাওয়া যেত। তাই লোকমুখে এই কথাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রবাদ বাক্যের আকাড় নিয়েছে। ১৮১০ সালের মালদা জেলা গোজ টায়ারের এক রিপোর্টে পাওয়া যায় কুটির শিল্প সম্পর্কে - The most inportant centres of cotton cloth wealing are the kaliachak thana. In the kharba thana the speciality is coloured masharies (netting). By G.E. lamb ourm.

ভারতীয় পাঠ ভবন -এ আজও রক্ষিত আছে কবি শিবরামের হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা মুরলী। মুলী পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তারাপদ মৈত্র এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন রাম রাঘব লাহিড়ী। কলিগ্রামের পল্লীহিত সাধন সমিতি এটি পরিচালনা করতেন। বহুপূর্বে বগচরাতে একসময় ডাচদের কুঠি ছিল। তাহারা ব্যবসা বানিজ্যের কারনে এখানে যাতায়াত করতেন ঁসুশীল কুমার লাহিরীর বাড়ীতে ছিল প্রচুর পুস্তকের সম্ভার ছাত্র জীবনে কবি শিবরাম নিয়মিত ভাবে কলিগ্রাম

থেকে বই এনে পড়তেন। স্বনামধন্য লেখম চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এর বাল্য বন্ধু ছিলেন কলিগ্রামে বিষ্টু সুকুল। চারুবাবুর "ভাবের জন্মকথা" — বইটি তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধু বিষ্টু সুকুলের নামে উৎসর্গ করেন। এই বইটি খুব কম লাইব্রেরীতে আছে পুনঃ প্রকাশ না হলে সে ইতিহাস গোপনই থেকে যাবে। একথা অনস্বীকার্য যে এই পুরাতন বর্ধিষ্ণু গ্রামটি একসময় মালদা জেলার শিক্ষা-দিক্ষা আর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। (কলিগ্রাম সম্বন্ধে আরো কিছু কথা জিন্দাপীর এবং শিবরাম নামক পর্বে আলাদা আলাদা পর্বে বিস্তররিত আলোচিত হয়েছে)

তথ্য পঞ্জি

☆ ঈশ্বর পৃথিবী জালসা - শিবরাম চক্রবর্তী
☆ কলিগ্রামের পরিচয় - শ্রীকৃষ্ণ বিনোদ গোস্বামী
☆ Malda District Gazeteer 1810 G.E. - Lambourn.
☆ Malda District Gazeteer 1869 J.C. Sengupta.
☆ অতীতের মালদহ - প্রবাল রায়

চাঁচলের চাষ বাসের কথা

ভৌগলিক দিক দিয়ে মালদা জেলার চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা অঞ্চল দুটি টাল/তাল অঞ্চল ভুক্ত। চাঁচল থানা অঞ্চলটি নদী বিধৌত নবীন পলি মাটি দ্বারা গঠিত। টাল/তাল কথাটির অভিধানিক অর্থ হল ক্রমশ নিচু জলাভূমি বা জঙ্গলাকীর্ণ নিচু জলাভূমি অথবা তীর্যক বা ঢালু জমি। বরিন্দ্র অঞ্চল অপেক্ষা এ-অঞ্চলের জমির উচ্চতা মাদ্যম। চাঁচল থানা অঞ্চলে বহু বড়-বড় খাল, বিল, পুকুর, জলাভূমি বিদ্যমান। ১৮৪৮ সালে জমি জরীপ কার্য্যের সময় ও এই এলাকার বহু অংশ খর্বাকার জঙ্গল ও তৃণ ঘাসে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমশ ঘনবসতির চাপে এই অঞ্চলের এবরো খেবরো উচু-নীচু জমি চাষ বাসের সুবিধার জন্য সমতল জমিতে পরিণত হয়েছে। চাঁচল থানার পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা নদীটি এছাড়া আর কোন বড় নদী নেই বললেই চলে। বিহার বা স্বরূপগঞ্জ থেকে আগত বারমাসিয়া নদীটি কনুয়া কলমি বিলে পড়েছে এবং পরে গোরকপুর ব্রীজের তলা দিয়ে কিছু জল নির্গত হয়ে চাঁচল ২নং ব্লকের কাঠান বিলে গিয়ে পড়েছে। মহানন্দার শাখানদী নাগর নামে খরবার পাশ দিয়ে বলরামপুর হয়ে পরবর্তীতে গাজোল থানা এলাকায় প্রবেশ করেছে। চাঁচলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মরা মহানন্দার কথা ফেরীঘাট পর্বে আলোচিত হয়েছে। ভূ-প্রকৃতির কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে চাঁচল এলাকার নদীর কূল এলাকায় বালুকাময় বেলে মাটির প্রভাব বেশি বলে এই সব অঞ্চলে পটল, শশা, তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি লতাজাতীয় ফসল খুব বেশি পরিমানে উৎপন্ন হয়।

পাট চাষ ঃ মালদা জেলায় যত পাট উৎপন্ন হয় তার প্রায় চল্লিশ শতাংশ পাট চাঁচল ১-২ ব্লক অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই উৎপাদিত পাট এখানকার প্রধান অর্থকরী ফসল। চাঁচল, সামসী কুশিদা ও তুলশীহাটা হাটে এই পাট অনায়াসে বিক্রি হয়ে যায়। এই পাট থেকেই এলাকার মারোয়ারী ব্যবসায়ী সমাজ, চাঁচল, সামসী, কোড়িয়ালি, তুলশিহাটা, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় তাদের বড় বড় গোডাউন গড়ে উঠেছে। ১১৭ কেজি প্রতিটি গাট তৈরী করে মারোয়ারী ব্যবসায়ী সমাজ এই গাটগুলিকে লরি মারফতে কলকাতার চট কলে পাঠিয়ে দেয়। এলাকার প্রধান

অর্থকরী ফসল পাট বিক্রি করেই চাষীরা তাদের সারা বছরের জামাকাপড়, জয়া চাষের জন্য তেল তুলে রাখা এবং আমন চাষের জন্য মূলধন যোগান প্রভৃতি কাজ করে থাকেন। উচু এবং মাঝারী জমিতে অর্থাৎ দোঁয়াশ মাটিতে এই পাট চাষ খুব ভালো হয়।

ধান চাষ বারোমাস ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এখানে সব রকম ধান খুব ভালো ভাবে হয়, অর্থাৎ ১) আমন ধান- বীজ তলা থেকে বর্ষা কালে আষাঢ় শ্রাবন মাসে রোপা করে কার্ত্তিক অগ্রহায়ন মাসে পাকা ধান কাটা হয়। ২) জয়া মরসুমে- জয়া ধানের চাষ আরম্ভ হয় গরম পড়লে ফাল্গুন অথবা মাঘ মাসে রোপন করে জৈষ্ঠ্য আষাঢ় মাসে ফসল কাটা হয়। এই চাষে সেচ ব্যবস্থা না থাকলে জয়া ধানের চাষ করা যায় না। এখন এই এলাকার চাষীরা দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল এবং মূলতঃ খাদ্য শস্য হিসাবে জয়া চাষের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই এলাকার আউস ধানের চাষ এক সময় খুব হোত বিগত ১১৭৫-৭৬ সালের পর থেকে এই আউষ ধান বা ভাদয় (ভাদই) ধান চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে প্রধানতঃ বপন প্রথার মাধ্যমে আউষ ধানের চাষ হোত এবং আষাঢ় মাসে ধান কেটে পুনরায় ঐ জমিতে আমন চাষ হোত এবং আষাঢ় মাসে ধান কেটে পুনরায় ঐ জমিতে আমন চাষ হোত কিন্তু চাঁচল এলাকায় এই প্রজাতির ধান বীজ গুলি বিলুপ্ত প্রায়। উর্বরা দোঁয়াশ এবং এটেল মাটিতে আমন ধান ও জয়া ধান খুব ভালো হয়।

গম চাষ ঃ চাঁচল এলাকায় শীতকালীন গম অর্থাৎ কল্যানী, সোনালিক, গঙ্গা, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি প্রজাতির গম চাষ খুব ভালো হয়। একটু উচু-উর্বর দোঁয়াশ মাটি সেচের সুবিধা থাকলে খুব ভালো হয়। এমন ধরনের মাটি চাঁচল এলাকায় বা টাল/তাল এলাকায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হল আমরা আমন ধান কাটার পর ঐ জমিতেই সাধারনত গম চাষ করে থাকি ফলে ইঁদুরের উৎপাতে প্রায় বেশির ভাগ গম কেটে নষ্ট করে দেয় সেই জন্য চাষীদের মধ্যে গম চাষের প্রতি অনীহা দেখা দিচ্ছে।

তৈলবীজ ঃ এলাকার তৃতীয় অর্থকরী ফসল এই তৈল বীজ অর্থাৎ পাট কাটার পর বা ধান কাটার পর অগ্রহায়ন মাসে সাধারনতঃ মাঝারী ও উচু জমিতে তৈলবীজ

আলুচাষ ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও আমরা থানাবাসি নৈনিতাল আলু বা দেশি আলুর জন্য পাটনা, সাইথিয়া বা গঙ্গার ওপার অর্থাৎ হুগলী, মুর্শিদাবাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ফলে কোন কোন বছর ১২/১৩ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে আলু কিনে খেতে হত। কিছুদিন আগেও আমরা কুশিদা হাটের আলুর ওপর নির্ভরশীল ছিলাম কিন্তু বিগত ১০/১২ বছর যাবৎ চাঁচল থানার চাষীরা প্রচুর পরিমানে আলুর চাষ করতে আরম্ভ করেছে। উর্বর দোঁয়াশ একটু উচু মাটিতে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাট কাটা মাটিতে আলু চাষ খুব ভালো হয়। বর্তমানে চাঁচল থানা এলাকার প্রায় সব জায়গাতেই আলুর চাষ হচ্ছে কিন্তু চাষীভাই সব থেকে বড় সমস্যা হল চাঁচল থানায় কোন হিমঘর নেই ফলে চাষীদের অগ্রহায়ন পোষ মাসে আলু উঠলে অল্পদামে বাজারে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে অথবা বহন খরচ দিয়ে সামসী হিমঘরে ভাড়া দিয়ে আলু রাখতে বাধ্য হচ্ছে। কয়েক বছর আগে বিশ্ব-ব্যঙ্কের একটি টিম এসে সমীক্ষা করে চলে গেলেন কিন্তু হিমঘরের কোন খবর আজও হয়নি। শিক্ষিত বেকার ভাইরা যদি একটি সমবায় করে সরকারী সহযোগিতায় চাঁচল থানা অঞ্চলে ২/৩টি সমবায় হিমঘর নির্মান করতে পারে তাহলে বেকারত্ব দুর হওয়ার সাথে সাথে চাষী ভাইদের অনেকটা সুবিধা হবে। এবারে একটু আলুচাষের ব্যপারে কথা বলি- সাধারণতঃ একটু উচু ধরনের জল দাড়ায় না অথচ সেচ-ব্যবস্থা আছে এমন ধরনের উর্বর দোঁয়াশ মাটি আলু চাষের পক্ষে খুবই উপযোগি। বীজ চাঁচল, কুশিদা ও সামসী হাটেই পাওয়া যায়। শ্রাবন মাসে পাট কাটা হলে একটু আর্লি অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন মাসে আলু লাগাতে পারলে এবং জলসেচ ও ধশা বা মাঝরা পোকার হাত থেকে বাঁচতে পারলে আর শীত পড়ার আগেই আলু ঘরে তুলতে পারলে চাষী ভাইরা খুব লাভবান হবে।

মেঘনাদ দাস

চাঁচল

তথ্য সহায়ক পুস্তকাবলী

১। বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-সুকুমার সেন
২। বাংলা স্থান নাম– সুকুমার সেন
৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস - আদিপর্ব নীহার রঞ্জন রায়
৪। মালদা জেলার ইতিহাস- প্রদ্যোত ঘোষ
৭। বাংলার ইতিহাস দুশো বছর- সুখময় মুখোপাধ্যায়
৮। চাঁচলের শরৎচন্দ্র - ভূপেন্দ্র নাথ দাস
৯। কলিগ্রামের পরিচয় - কৃষ্ণ বিনোদ গোস্বমী
১০। মালদা জেলার ইতিহাস ও জেলা সমগ্র - আব্দুস সামাদ
১১। অতীতের মাদহ - প্রবাল রায়
১২। মালদা জেলার ইতিহাস চর্চা- অধ্যাপিতা সুষ্মিতা সোম
১৩। ডোমনী - সুবোধ চৌধুরী
১৪। শেরশা বাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি- মীর রেজাউল করিম
১৫। ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ- ইচ্ছামুদ্দিন সরকার সম্পাদিত
১৬। বাংলা ও বাঙ্গালী - ড. স্বপন কুমার মন্ডল
১৭। গৌড় লেখ মালা - অক্ষয় কুমার মৈত্র
১৮। গৌড় রাজমালা - বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সঙ্কলিত- রমা প্রসাদ চন্দ্র
১৯। মালদহের লোক সংস্কৃতি - ড. রাধাগোবিন্দ ঘোষ
২০। উজ্জীবন পত্রিকা- চাঁচল নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষন কলেজ- ১৩৭৭ সাল
২১। সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিন ১৯৭৯
২২। বাতায়ন পত্রিকা -A.B.T.A
২৩। সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়ের যাবতীয় অফিস তথ্য
২৪। লালমাটি - নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
২৫। আনন্দ মঠ - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৬। নীল দর্পন- দীনবন্ধু মিত্র
২৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা- অশোক মিত্র সম্পাদিত।
২৮। জেলা মালদহের পীর ফকিরদের কথা- আব্দুস সামাদ।
২৯। সিদ্ধার্থ গুহ রায় প্রণীত - মালদা

৩০। বাংলা দেশের ইতিহাস - ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার
৩১। এক নজরে মালদা - সুধীর কুমার চক্রবর্তী।
৩২। উত্তর বঙ্গের ইতিহাস- সুকুমার দাস
৩৩। Malda District Gazeteer - G.E. Lambourn (1910)
৩৪। The statistical Account of Bengal - W.W. Hunter
৩৫। The statistical Account of Maldah - W.W. Hunter (1876)
৩৬। Malda District Gazeteer - J. C. Sengupta 1969
৩৭। Final Report on the survey and sattlement in the District of Maldah- 1328-33 by- M.O. curter
৩৮। The Tribe and caste of Bengal by- H. H. Risley
৩৯। Purnia District Gazeteer- G.E. Lambourn
৪০। রাজশাহী জেলা গেজেটি রায় - প্রাচীন
৪১। শিবরাম রচনাবলী - শিবরাম চক্রবর্তী
৪২। ইশ্বর পৃথিবী ভালভাসা - শিবরাম চক্রবর্তী
৪৩। ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর - শিবরাম চক্রবর্তী
৪৪। সমরপিতা - শিবরাম চক্রবর্তী
৪৫। শিবরাম স্মরণীকা - শিবরাম মেলা- ২০০৬, চাঁচল
৪৬। উত্তর বঙ্গ নামের সন্ধানে - ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ
৪৭। তেভাগা আন্দোলন - ধনঞ্জয় রায়
৪৮। উত্তরাধিকার - সমরেশ মজুমদার
৪৯। গড় শ্রীমন্ত - অমিয় ভূষণ মজুমদার
৫০। তীস্তা পারের বৃত্তান্ত- দেবেশ রায়
৫১। দেবী চৌধুরানী - বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫২। A short History of Gour and Pandua - Kalipada Lahiri
৫৩। গাজোলের ইতি কথা - কালীপদ সরকার
৫৪। মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা - ১৪১৫ সাল
৫৫। বাংলা অভিধান - সংসদ

আমার ব্যক্তিঋন

১। লাইব্রেরীয়ান - কোচবিহার লাইব্রেরী
২। ঐ - সাহিত্য পরিষদ শিলিগুড়ি
৩। ঐ - মালদা লাইব্রেরী
৪। ঐ - জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা
৫। ঐ - নদিয়া লাইব্রেরী
৬। মধুমিতা ঘোষ লাইব্রেরীয়ান - চাঁচল
৭। মানিক চন্দ্র দাস - চাঁচল কুমার শিবপদ লাইব্রেরী
৮। দীপঙ্কর দাস - ইতিহাস শিক্ষক সিদ্ধেশ্বরী স্কুল
৯। ফরিদ আলী - ভূগোল শিক্ষক ঐ
১০। শুভময় গোস্বামী - বাংলা শিক্ষক ঐ
১১। সৌরভ রায় - ইতিহাস শিক্ষক ঐ
১২। অনিরুদ্ধ সাহা - বাংলা শিক্ষক ঐ
১৩। কমল কৃষ্ণ দাস - জীবন বিজ্ঞান শিক্ষক ঐ
১৪। সুখেন্দু শেখর সিকদার - বাংলা শিক্ষক ঐ
১৫। দিলিপ দাস - করনিক রাণী দাক্ষায়ণী স্কুল
১৬। অসীমা ত্রিবেদী - প্রধান শিক্ষিকা ঐ
১৭। কৃষ্ণ গোপাল মন্ডল - সম্পাদক ঐ
১৮। আসরাফুল হক্ প্রধান শিক্ষক - সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যালয়
১৯। গৌতম গাঙ্গুলী - কুমোড় পাড়া চাঁচল
২০। উজ্জ্বল কুমার দাস - চাঁচল
২১। উৎপল কুমার দাস - চাঁচল
২২। জয়দীপ দাস - ছাত্র দ্বাদশ শ্রেণী (সুকান্ত পল্লী, চাঁচল)
২৩। সুদীপ্ত দাস - ছাত্র দশম শ্রেণী —ঐ
২৪। নন্দ দুলাল রাম - চাঁচল
২৫। শ্রীমতি অরুনা দাস- লেখকের ধর্মপত্নী
২৬। অজিত কুমার মজুমদার - চাঁচল
২৭। তপন ভট্টাচার্য্য - পূজারী মালতীপুর কালীমন্দির

২৮। অভিজিত দাস - ছাত্র চাঁচল
২৯। গৌতম মন্ডল - ভাকরী মালদহ
৩০। আসরারুল হক - প্রধান শিক্ষক সিদ্ধেশ্বরী
৩১। সন্দীপ ব্যানার্জী - বামুন পাড়া - চাঁচল
৩২। উৎপল দাস (বুলু) ঐ
৩৩। অচিন্ত কুমার সরকার - অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সিদ্ধেশ্বরী
৩৪। গৌতম বর্মন সম্পাদক সিদ্ধেশ্বরী
৩৫। সুশীল সরকার - সুকান্তপল্লী চাঁচল
৩৬। দ্বিজেন্দ্র নাথ দাস - মালতীপুর
৩৭। মমতাজ আলী- প্রধান শিক্ষক গোবিন্দপাড়া হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)
৩৮। প্রভাস কর্মকার - মালতীপুর
৩৯। শিবেশ দাস- করনিক - কলিগ্রাম স্কুল
৪০। প্রবীর কুমার সাহা- ঘোষপাড়া, চাঁচল
৪১। সঞ্জিব দাস- অমলাপাড়া।
৪২। সাধন মণ্ডল- ভারতি নগর।
৪৩। অরুপ সরকার- থানাপাড়া।
৪৪। বিশ্বজিৎ মণ্ডল- থানাপাড়া।
৪৫। মানস মণ্ডল- থানাপাড়া।
৪৬। দেবব্রত মণ্ডল- থানাপাড়া।

চাঁচল জামে মসজিদ

চাঁচল ঠাকুর বাড়ি